ঘোলা জল
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

ঘোলা জল-৮৭

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মিস রীনার কণ্ঠস্বর থেমে যাবার পূর্বেই পিঠে ঠান্ডা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করলো হিরন্ময়। ধীরে ধীরে তার হাতখানা হাল্কা হয়ে এলো। মিস রীনা দেখতে পেলো হিরন্ময়ের পিছনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি— তার দেহে জমকালো পোশাক, হাতে রিভলবার কিন্তু রিভলবারখানা চেপে বসে গেছে হিরন্ময়ের পিঠে।

রীনার গলা থেকে হিরন্ময়ের হাত দু'খানা সরে যেতেই সে সরে দাঁড়ালো। অসহায় চোখে তাকালো রীনা জমকালো পোশাকপরা ব্যক্তির দিকে। ভাবলো রীনা কে এই ব্যক্তি, যার জন্য সে এই দণ্ডে জীবনে বেঁচে গেলো? হিরন্ময় তাকে এখানে এনেছিলো হত্যার উদ্দেশ্যে। রীনা পায়রার ছানার মত থরথর করে কাঁপছে। বারবার সে তাকাচ্ছে আগন্তুকটার দিকে, কে এই ব্যক্তি ভেবে পাচ্ছে না।

হিরন্ময়ও কম অবাক হয়নি, তার নীল সাগরতলে স্বর্ণগুহার সন্ধান কেউ কোনোদিন পাবে, এ ধারণা তার কোনোদিন ছিলো না। জমকালো মূর্তির মুখ ঢাকা থাকায় সে চিনতে পারলো না, কে এই ব্যক্তি যে তার এই দুর্গম স্বর্ণাগারের ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসা হিরন্ময়ের আজকের নয়, দীর্ঘ বিশ বছর ধরে পৃথিবীর নানা স্থানে সে নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। তবে সৎ ব্যবসা সে জানে না, সব সময় কালোবাজারে কালো ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে এসেছে। স্বার্থান্ধ হিরন্ময় কোনোদিন ভাবেনি তার ব্যবসায়ে কেউ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। যারা তার পাশে এসেছে, সবাইকে সে নিজের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। যার দ্বারা বেশি লাভবান হয়েছে তাকে কিছু বেশি সময় নিজেদের ব্যবসার সঙ্গে লিপ্ত রেখেছে কিন্তু যখনই সে পাওনা গন্ডায় হিসেব নিকেশের কথা তুলেছে, তখনই তাকে কৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে সুচতুর হিরন্ময়।

বিদেশী রাষ্ট্রের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি হিরন্ময়। প্রথমে সামান্য ব্যবসা নিয়ে সাধারণভাবে পা বাড়িয়েছিলো কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য অল্পদিনেই হিরন্ময় তার গোপন ব্যবসায়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলো। তাই বিদেশী রাষ্ট্রের অসৎ অধিনায়কগণ তাকে বহু অর্থ পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন। যত পেয়েছিলো হিরন্ময় তত তার লোভের মাত্রাও বেড়েছিলো অসম্ভবভাবে।

শুধু একটি দেশেই তার গোপন ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিলো না, পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা ব্যবসার ছলনায় হিরন্ময়ের অনুচরগণ কাজ করে

যাচ্ছিলো। এমন নিপুণভাবে সে কাজ করছিলো সাধ্য নেই কেউ তাকে বা তার দলকে সন্দেহ করে। এমন দক্ষভাবে কাজ করার জন্য বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্রের দুষ্ট-নেতৃবৃন্দ তাকে গোপনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতো।

হিরন্ময় এক সময় এক জলদুস্য দলের সর্দারের সঙ্গে মিলিত হয়। কৌশলে সে জলদস্যু সর্দারের মনে সূচের মত প্রবেশ করে। দলপতির সঙ্গে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, সব সময় দলপতির পাশে পাশে থাকতো হিরন্ময় কতকটা দেহরক্ষী হিসেবে।

একদিন কোনো এক বিপদ মুহূর্তে সুচতুর হিরন্ময় নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচায় দলপতিকে। সেদিন দলপতি খুশি হয়ে হিরন্ময়কে আলিঙ্গন করেছিলো, বলেছিলো—তুমি কি চাও বলো আমার কাছে?

হিরন্ময় বলেছিলো—তুমি আমাকে বন্ধুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছো, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

জলদস্যু সর্দার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো হিরন্ময়ের অনুরাগভরা কথায়। এমন ভাবাপন্ন আবেগময় কথা সে এর পূর্বে শোনেনি কোনোদিন। জলদস্যু হলেও দলপতির মন ছিলো সরল। তাই সে সরল বিশ্বাসে হিরন্ময়কে একদিন নিয়ে গিয়েছিলো তার নীলসাগর তলের গোপন আস্তানায়। সরল মনে দলপতি দেখিয়েছিলো তাদের দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত অর্থ এবং ধনসম্পদ।

হিরন্ময় সেদিন খুশিতে হেসেছিলো মৃদু মৃদু।

তারপর থেকে হিরন্ময়ের লোভ হয়েছিলো কেমন করে এই নীলসাগর তলের ধনসম্পদ আত্নসাৎ করা যায়, কেমন করে জলদস্যু সর্দারকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

একদিন হিরন্ময়ের সুযোগ এলো।

জলদস্যু সর্দারকে কৌশলে নিয়ে গেলো সে কোনো এক নির্ভৃত জায়গায়। পুলিশ বাহিনীকে পূর্ব হতেই জানিয়ে রেখেছিলো হিরন্ময়, জলদস্যু সর্দার সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে ফেললো। জলদস্যু সর্দার ভাবতেও পারেনি, যে ব্যক্তি তাকে একদিন মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছে, আজ সেই ব্যক্তি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। জলদস্যু সর্দার বন্দী হাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে হিরন্ময় তাদের স্থল আস্তানায় হানা দিয়ে জলদস্যুদের সবাইকে গ্রেপ্তার করালো অতি দক্ষতার সঙ্গে।

জলদস্যুরা সেদিন আনন্দ উৎসবে মেতে ছিলো, তাই তাদের গ্রেপ্তার করতে বেশি বেগ পেতে হলো না। জলদস্যুরা অত্যন্ত বিশ্বাস করেছিলো হিরন্ময়কে, তাই তার পরিণামে হলো তাদের শোচনীয় পরাজয়।

জলদস্যু সর্দার ও তার দলবলকে হিরন্ময় পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে নিজে জলদস্যু জলযান নিয়ে গোপনে নীলসাগর তলের আস্তানা দখল করে বসলো। সেখানে সে হলো একক রাজাধিরাজ। প্রচুর অর্থ, ধনসম্পদ এবং সোনাদানা হিরন্ময়কে আরও লোভাতুর করে তুললো। সে কেমন করে আরও অর্থ ও ধনসম্পদ করবে তারই চিন্তায় অস্থির হলো। গোপনে সে দেশের নেতৃ ব্যক্তিদের হাত করে নিলো। অবশ্য সে নিজেও ছিলো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, তাই অতি সহজেই দেশের মহান ব্যক্তিগণকে হিরন্ময় হাত করে নিতে সক্ষম হলো।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অবশ্য পূর্ব হতেই কিছু কিছু গলদ ছিলো, তারা সুযোগ পেয়ে আরও উৎসাহী হলো, যোগ দিলো হিরন্ময়ের সঙ্গে।

হিরন্ময় তার নীলসাগর তলের আস্তানার কথা কাউকে বললো না। দু'একজন বিশিষ্ট অনুচর ছাড়া কাউকেই সে বিশ্বাস করলো না। চললো তার চোরাকারবার, দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে কারবারটিকে আরও জোরদার করে তুললো।

একটা জাহাজ নিয়ে প্রথমে ব্যবসা আরম্ভ হলো হিরন্ময়ের, তারপর আরও একটা। এমনি করে বেশ কয়েকটা ছোটবড় জাহাজের অধিকারী হলো হিরন্ময়।

পুরুষ সহকারীদের নিয়ে তার ব্যবসা চলছিলো। কিন্তু নানা প্রয়োজনে একটা মহিলা সহকারিণী দরকার হলো তার। কিন্তু মহিলা চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। হিরন্ময় নিজে সন্ধান করে চললো একটা নারীর।

বরাৎ ভাল বলতে হবে, একদিন এক তরুণী এলো তার অফিসে চাকরির সন্ধানে।

হিরন্ময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো মিস রীনা। প্রথম দিনই রীনাকে চাকরি দেবে বলে জানিয়ে দিলো হিরন্ময়।

রীনার দু'চোখে খুশির উচ্ছ্বাস। অনেক আশা ভরসা নিয়েই সে বেরিয়েছিলো সেদিন ঘর থেকে। বাড়িতে ছিলো তার বৃদ্ধ মা আর ছোট একটা বোন। মা ও বোনের জন্য রীনা চাকরি গ্রহণ করলো।

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই রীনা মাকে হারালো—ছোট বোন একা, তাকে নিয়ে বিপদে পড়লো সে অথচ চাকরি না করলে চলবে না একটা দিন। রীনা ছোট বোন মীরাকে রেখে এলো এক আত্মীয়ের বাড়ি।

কতকটা নিশ্চিন্ত হলো রীনা।

চাকরি তার তখন পাকা হতে চলেছে।

হিরন্ময় রীনাকে ধীরে ধীরে পাকিয়ে নিচ্ছিলো। চট্ করে তো তার গোপন ব্যবসায় ওকে টেনে নেওয়া যায় না, কিন্তু বেশিদিন হিরন্ময় রীনাকে সময় দিলো না, তাকে কৌশলে বাগিয়ে নিলো বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে।

রীনার টাকার প্রয়োজন নিজের চেয়ে বেশি তার ছোট বোন মীনার জন্য। মীনাকে আত্মীয়ের বাড়ি রাখলেও তাকে মাসের প্রথমে মীনার জন্য দিতে হতো বেশ মোটা অংক। এ টাকা না পেলে তারা মীনাকে রাখতে রাজি নয়।

রীনা অসহায়, তাই হিরন্ময়ের পাপ কাজে সহায়তা করতে রাজি হলো কতকটা বাধ্য হয়েই।

প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো রীনা—সে সংকুচিত হতো, ভীত হতো, দরু দুরু বুকে পা বাড়াতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রীনার সবকিছু সহ্য হয়ে গেলো, যদিও বিবেক তার এসব কাজে বাধা দিতো তবু সে তখন নিরুপায়।

ভাবতো রীনা পৃথিবী বড় রহস্যময় স্থান। বিচিত্রময় পৃথিবীর বৈচিত্রময় রূপ, এখানে বাস করে নানারকম জীব। কতরকম পশু পাখি, কীটপতঙ্গ, কতরকম জানোয়ার। সবার মধ্যে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠ জীব কিন্তু সেই জীবের মধ্যেও আছে কতরকম স্তর! প্রথম স্তর হলো যা সবার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—কালো ফর্সা শ্যামলা। আরও স্তর আছে যা মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—সে হলো মানুষের মন। কার মন কেমন এটা কারও চোখে ধরা পড়ে না, বিচার করা যায় অন্তর দিয়ে। বিচার করা যায় তার ব্যবহারে, তার আচরণে।

রীনা হিরন্ময়কে চিনতে পারলো তার আচরণে। সাধুতার মুখোস পরে একটা জীবন্ত শয়তান সে তাতে কোনো ভুল নেই। রীনার বিবেক প্রথমে বাধা দিলো, কিন্তু বিবেকের কাছে নতি স্বীকার করতে পারলো না রীনা।

ক্রমান্বয়ে রীনা দক্ষ সহকারিণী হয়ে উঠলো হিরন্ময়ের। তার দক্ষিণ হাত হিসেবে তাকে সব কাজে সহায়তা করে চললো, তবে মাঝে মাঝে মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতো রীনার—ভাবতো এসব কি করছে সে—এত জঘন্য সে হতে পারলো কি করে! কিন্তু অসহায় সে, পিছু হটবার সময় তার নেই।

তবু একদিন বিদ্রোহী হলো রীনা, যেদিন সাংহাবারীর মত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করলো হিরন্ময়। রীনা প্রকাশ্যে বললো—এসব কাজ তোমার অন্যায়।

হিরন্ময় সেদিন বুঝতে পারলো রীনাকে দিয়ে তার কাজ শেষ হয়েছে, আর ওকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব হবে না। বিদায় দেওয়াও যায় না, ওকে বিদায় দিলে তাদের সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে, কাজেই রীনাকে নীলসাগর তলে তার গোপন স্বর্ণগুহায় চিরদিনের জন্য বন্দী করে রাখবে। সে হবে স্বর্ণগুহার যক্ষ—নীলকমল।

কিন্তু সে সুযোগ হিরন্ময় আর পেলো না। আর একটু হলেই রীনাকে সে গলা টিপে হত্যা করতো, রীনার প্রাণহীন দেহটা হিরন্ময় তার স্বর্ণগুহায় পুঁতে রাখতো।

সব তার ব্যর্থ হলো, রীনাকে হত্যা করা তার হলো না, ফিরে তাকালো সে জমকালো পোশাকপরা আগন্তুকের দিকে। হিরন্ময়ের হাতে কোনো অস্ত্র ছিলো না, সে রীনাকে গলা টিপে হত্যা করতে গিয়েছিলো, অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন ছিলো না, তাই সে হকচকিয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য।

জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর। রীনাকে যখন হিরন্ময় তার জলযানে করে নিয়ে আসে নীলসাগরের তলদেশে তখন স্বয়ং বনহুর ছিলো সেই জলযানের চালক। হিরন্ময় বুঝতেই পারেনি তার বিশ্বস্ত চালকের স্থানে আজ যে বসে আছে সে তার সিম্মো নয়।

হিরন্ময় একমাত্র সিম্মো চালককে ছাড়া কাউকে নীলসাগর তলে জলযান চালক হিসেবে নিয়ে আসে না।

হিরন্ময় তাই থ' হয়ে যায় প্রথমে, তারপর নিজকে সামলে নিয়ে বললো—তুমি এখানে কি করে এলে?

বনহুরের মুখের নিচের অংশ ঢাকা ছিলো, এবার সে কালো রুমালখানা সরিয়ে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে হিরন্ময় অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—তুমি!

হাঁ, আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছো বন্ধু?

হিরন্ময় বললো—আমি কে বলেছি তোমার উপর কড়া নজর রাখতে, কারণ তুমি কে এই ফাংহায় কেউ তা জানে না, শুধু জানি আমি কিন্তু কাউকে এখনও তোমার আসল পরিচয় বলিনি।

বলোনি বলেই তোমাকে এখনও আমি বন্ধু বলে সম্বোধন করছি। কিন্তু আজ থেকে তোমার পাপ কাজের সমাধি রচনা হবে এই নীলসাগর তলে।

হিরন্ময় দাঁতে দাঁত পিষে বললো—জানো আমি তোমাকে এই দণ্ডে হত্যা করতে পারি?

বনহুর হাল্কাভাবে হেসে বললো—যেমন মিস রীনাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলে?

রীনা আরও বিস্মিত হয়, কি করে জমকালো পোশাকধারী তার নাম জানলো? সব যেন তার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে। রীনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বনহুর কিন্তু মুহূর্তের জন্য হিরন্ময়ের বুক থেকে রিভলবারের নল সরিয়ে নেয়নি।

হিরন্ময় বারবার তাকাচ্ছে নিজের বুকে চেপে থাকা রিভলবার খানার দিকে।

বনহুর বললো—তোমাকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারি কিন্তু করবো না, কারণ তোমার মত পাপীকে এত সহজে সরিয়ে ফেলতে চাই না।

তুমি কি আমাকে......

হাঁ, সাপুড়ে যেমন সাপ নিয়ে খেলা করে, তেমনি আমি তোমাকে নিয়ে খেলা করবো। আমি সাপুড়ে আর তুমি সাপ, বুঝলে? সাপ দিয়ে সাপ ধরতে চাই আমি। তারপর রীনার দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর—মিস রীনা, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন এ ব্যাপারে?

রীনার মুখ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো, বনহুরের কথায় বললো সে—আপনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। আপনি না এলে এতক্ষণ আমার মৃত্যু ঘটতো...জানি না আপনি কে, কি আপনার পরিচয় তবু আপনার আদেশ আমি মেনে চলবো...এটা আমার কর্তব্য......

হিরন্ময় এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো। কেমন করে সেই জমকালো মূর্তির কবল থেকে উদ্ধার পাবে, এই মুহূর্তে সেই চিন্তাই করছিলো হিরন্ময়। বনহুরের পা থেকে মাথা অবধি তাকিয়ে মাঝে মাঝে দেখছিলো, সে জানে তার শক্তি ওর কাছে সামান্য।

হিরন্ময় শয়তান কিন্তু শক্তিশালী নয়। সে দুষ্ট বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতো, দৈহিক শক্তি তাকে কোনো সময় প্রয়োগ করতে হতো না।

বনহুর আর বিলম্ব না করে নিজের পকেট থেকে একটি সিল্ক কর্ড বের করে হিরন্ময়ের হাত মজবুত করে বেঁধে ফেললো।

হিরন্ময় এক চুল নড়তে পারলো না, সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, বললো—আমাকে ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও, তুমি যা চাইবে তাই দেবো।

হেসে বললো বনহুর—তোমার কি আছে যা তুমি আমাকে দেবে। তুমি এখন রিক্ত, নিঃস্ব......এতদিন অন্যায়ভাবে যা তুমি সঞ্চয় করেছিলে বা করেছো সব তুমি হারিয়েছো। একটা জিনিস এখন তোমার আছে, সে হলো তোমার জীবন!

হিরন্ময়ের মুখখানা দেখলে এখন নির্দয় পাষন্ড ব্যক্তিরও মায়া হবে তবু মায়া হয় না দস্যু বনহুরের, দাঁতে দাঁত পিষে বলে—চলো আমার সঙ্গে?

কোথায়? কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

যেখানে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে। এসো এবার...তারপর রীনার দিকে তাকিয়ে বলে—মিস রীনা, হিরন্ময় আপনাকে নীলসাগর তলে

নীলকমল বানিয়ে রাখতে চেয়েছিলো—তা আর হলো না, এবার চলুন, আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে।

মিস রীনা বললো—চলুন কোথায় যেতে হবে, নিয়ে চলুন।

বনহুর হিরন্ময় সহ রীনাকে নিয়ে জলযানে এসে বসলো। বনহুর জলযানে বসবার পূর্বে সিম্মোর ড্রেস পরে নিলো, যে ড্রেস পরে সে নীল সাগর তলে এসেছিলো।

হিরন্ময় জলযানে চেপে বসে ভাবতে লাগলো, সিম্মোবেশে তাহলে দস্যু বনহুর এসেছিলো তাকে নিয়ে নীলসাগর তলে। সিম্মো বেশেই তাহলে বনহুর জাহাজে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো, যে সব গোপন আলোচনা হয়েছিলো সবই তাহলে বনহুর নিজ কানে শুনেছে। শুধু নীলসাগর তলে স্বর্ণগুহাই নয়, তার অন্যান্য গোপন ব্যবসা কেন্দ্রের সন্ধানও তাহলে সে জেনে নিয়েছে। সব গোপন কথাই বনহুর তাহলে জানে......

জলযান চালনা করে চলেছে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

হিরন্ময়ের হাত দু'খানা সিল্ক কার্ড দিয়ে মজবুত করে বাঁধা। অবশ্য পা দু'খানা খোলা আছে, ইচ্ছা করলে সে সাগরবক্ষে লাফিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সে লাফিয়ে পড়বে না জানে বনহুর, কারণ হিরন্ময়ের লোভ অত্যন্ত বেশি। দুনিয়া ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা নেই মোটেই। এত ধনসম্পদ আর সোনাদানার মোহ ছেড়ে যাওয়াটাও কম কথা নয়। বনহুর তাই নিশ্চিন্তে জলযান চালিয়ে চলেছে।

মিস রীনার চোখে বিস্ময়, মনে দ্বন্দ্ব, কে এই মহান ব্যক্তি যার আচরণ তাকে শুধু হতবাকই করে চলেছে, কোনো সমাধানই যেন খুঁজে পাচ্ছে না। ইনি তাকে এবং হিরন্ময়কে নিয়ে কোথায় চলেছেন, কি উদ্দেশ্য তাও জানে না ওরা। রীনা শুধু নীরবে ভাবছে।

এখন যে জলযানটিতে তারা আরোহণ করে চলেছে সেটা গভীর জলের তলদেশ দিয়ে চলাফেরা করে থাকে। এই জলযানটি দেখতে কতকটা সাবমেরিনের মত। সম্মুখে কাঁচের আবরণ, চারপাশে মজবুত ইস্পাত দিয়ে তৈরি বেষ্টনী। এই জলযানটি চলাকালে দু'পাশে দুটি পাখা বেরিয়ে আসে। জলযানটি চলাকালে কতকটা তিমি মাছের মত মনে হয়।

এক সময় জলযানটা ভেসে উঠলো পানির উপর। রীনা দেখলো একটি অদ্ভুত জলযান ভেসে আছে পানির বুকে।

তাদের জলযানটা এসে ভিড়লো অদ্ভুত জলযানটার গায়ে। হিরন্ময় আর রীনাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—আসুন, এবার নেমে আসুন।

হিরন্ময়ের চোখ দিয়ে এখন যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, তাকে এমন পরাজয় বরণ করতে হবে সে ভাবতেও পারেনি।

বনহুর যখন রিভলবার ডান হাতে তার বুকে চেপে ধরে বাম হাতে পকেট থেকে সিল্ক কর্ড বের করে কৌশলে হিরন্ময়ের হাত দু'খানা বেঁধে ফেললো তখন হিরন্ময়ের ইচ্ছা করছিলো তাকে বাধা দেয় কিন্তু সে জানতো, বনহুরকে বাধা দেওয়ার সাধ্য তার হবে না। সুচতুর হিরন্ময় তাই নীরবে হাত দু'খানা তুলে ধরেছিলো বনহুরের সামনে কারণ সে আরও জানতো, যদি সে প্রতিবাদ করে তাহলে রিভলবারের গুলী তার বুক ভেদ করে চলে যেতে পারে, কাজেই সে উপস্থিত জীবনরক্ষার একটা সহজ উপায় খুঁজে নিয়েছিলো। ঐ মুহূর্তে জীবনরক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা। যদি জীবনে বেঁচে যায় তাহলে কোনোক্রমে কৌশলে পরিত্রাণও পেতে পারে। চালাক হিরন্ময় তাই চুপচাপ বসেই ছিলো এতক্ষণ।

মিস রীনাকে বেশ খুশিই মনে হচ্ছে। নিজের জীবনরক্ষার চেয়ে নরশয়তান হিরন্ময় যে সায়েস্তা হতে চলেছে, এটাই তার বড় আনন্দ। অবশ্য মিস রীনাও চুপচাপ বসেই ছিলো।

বনহুর যখন উঠে দাঁড়ালো তখন মিস রীনাও উঠে পড়লো।

হিরন্ময়ও যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালো। বনহুরকে অনুসরণ করে সেও নতুন অদ্ভুত জলযানে আরোহন করলো।

বনহুর নিজে জলযান চালনা করে চললো।

পিছন আসনে বসে আছে মিস রীনা ও হিরন্ময় বাবু। তারা নির্বাক দৃষ্টি মেলে শুধু বনহুরকে লক্ষ্য করে চলেছে, কারও মুখে কোনো কথা নেই।

তবে প্রত্যেকের মনে চিন্তা তোলপাড় করছিলো সেটা সত্য।

নিস্তব্ধ আজ সাগরবক্ষ।

নীলসাগরের নীল পানিতে নেই কোনো উচ্ছলতা, নেই কোনো আলোড়ন।

বনহুরের অদ্ভুত জলযান তীরবেগে ছুটে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে, কোন্‌দিকে যাচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সূর্যের আবির্ভাবে দিক নির্ণয় করা সহজ হলো। সোজা দক্ষিণ দিকে বনহুরের অদ্ভুত জলযান এগুচ্ছে বলে মনে হলো।

ঘন্টাকয়েক কাটতে না কাটতে তীর দেখা গেলো—দূরে অনেক দূরে একটা রেখার মত বলে মনে হলো প্রথমে, তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো রেখাটা। মাথার উপর গাংচিলরা উড়ে বেড়াচ্ছে। তবে খুব উঁচুতে দেখা যাচ্ছে পাখিগুলোকে।

বনহুরের দেহে এখনও সিম্মোর পোশাক। মাথায় একটা ক্যাপ। ক্যাপের আড়ালে মুখখানা তার প্রায় অর্ধেক ঢাকা পড়েছে।

রীনা বনহুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো অদ্ভুত জলযানের অদ্ভুত এক পুরুষ এই লোকটা! যেমন ললাট তেমনি উন্নত নাসিকা, সর্বোপরি দুটি চোখের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—রীনা এমন পুরুষ জীবনে দেখেনি, বিস্ময় তাকে অভিভূত করে তুলেছে।

রীনার মনে নানা প্রশ্ন, কে এই ব্যক্তি যে নীলসাগর তলে হিরন্ময়ের গোপন ঘাটিতে অনায়াসে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে? হিরন্ময়ের মত ব্যক্তি তাকে দেখেই যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলো, যেমন সিংহের আবির্ভাবে মেষশাবক জড়োসড়ো হয়ে যায়, টিক তেমনি। কই, মুখখানা তো খুব ভয়াল মনে হচ্ছিলো না তবু তাকে দেখে হিরন্ময়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে। হিরন্ময়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো সে ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছে, যদিও হিরন্ময় সে ভাবকে চাপা দেবার বৃথা চেষ্টা করছিলো।

রীনা যখন এ সব চিন্তা করে চলেছে তখন হিরন্ময় ভাবছে আজ কোন্ কুলক্ষণেই না রাত ভোর হয়েছিলো। রীনাকে আজ সে হত্যা করতে গিয়েছিলো, সেটাও আজ অশুভ হলো, তাকে হত্যা করা হলো না। এর পিছনে রানীর তো কোনো ষড়যন্ত্র ছিলোনা? রীনার মুখোভাব দেখে মনে হলো সে তাকে চেনে না। তবে কি সত্যি রীনা তাকে চেনে না জানে না? তাই হবে, নাহলে রীনা ওর সঙ্গে কথা বলতে বা তার চালচলনে বোঝা যেতো সে তাকে জানে। দস্যু বনহুরকে সে কড়া নজরে রেখেছিলো, অবশ্য আর্মের উপরই ছিলো সে দায়িত্ব। হিরন্ময় আর্মের কাছেও দস্যু বনহুরের আসল পরিচয় জানায়নি, কারণ এতে তার মনে দুর্বলতা আসতে পারে। আর্ম জানে ফাংহা ডাকবাংলোতে যে থাকে সে হলো মিঃ আলম।

হিরন্ময়ই প্রথম জানতো না স্বয়ং দস্যু বনহুর সুদূর কান্দাই থেকে এখানে এই ফাংহা শহরে এসেছে। যেদিন সে আর্মের মুখে শুনলো ফাংহা হত্যাকাণ্ডের সন্ধানে এক পুরুষ এসেছে তার সহচর নিয়ে এবং তারা ফাংহা ডাকবাংলোয় আছে। আরও যে বর্ণনা তার সে শুনেছিলো আর্মের মুখে, তাতেই হিরন্ময় বুঝতে পেরেছিলো সে ব্যক্তি সাধারণ লোক নয়। সে কারণেই হিরন্ময় গিয়েছিলো রাতের অন্ধকারে ফাংহা ডাকবাংলোয়।

আড়াল থেকে সে লক্ষ্য করতেই আঁতকে উঠেছিলো। সে যা ভেবেছিলো তাই সত্য, ফাংহার ডাকবাংলোর মধ্যে যাকে দেখলো সে হলো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

নিজে জানলেও হিরন্ময় কাউকে জানালো না এই কথাটা, কারণ দস্যু বনহুর নাম শুনলে অনেকেই ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। যে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে হিরন্ময় ফাংহায় অবস্থান করছে, হয়তো সে কাজ সমাধা হবে না—

তার অনুচরগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তাই সে গোপন করে গেলো সবার কাছে দস্যু বনহুরের পরিচয়, এমনকি আর্মকে বলেছিলো, ঐ মিঃ আলম সাধারণ ব্যক্তি নয়। আমাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে ওর উপর কড়া নজর রাখতে হবে। ও যেন আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে।

আর্ম অবশ্য হিরন্ময়ের কথামত সর্বক্ষণ ফাংহা ডাকবাংলোর উপর কড়া পাহারা রেখেছিলো। যখন সে কাজে যেতো তখন তার কোনো অনুচরকে রেখে যেতো পাহারায়। অবশ্য দূর থেকেই সে ডাকবাংলোর উপর নজর রাখতো। তাই বনহুরের পরিবর্তে রহমান বাংলোর অভ্যন্তরে থাকলেও তারা মনে করতো মিঃ আলমই আছেন কক্ষমধ্যে।

আর্ম একদিন নিজে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে এবং সে দেখতে পায় যে ব্যক্তিকে তার পাহারাদার পাহারা দিয়ে রাখে সে মিঃ আলম নয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি রহমান।

সবেমাত্র রহমান মিঃ আলমবেশী সর্দারকে বিদায় দিয়ে ফিরে দাঁড়াতে যাবে, সেই মুহূর্তে কাঁধে হাত পড়ে তার।

ওদিকে তখন বনহুর মিস রীনা ও হিরন্ময়কে নিয়ে হাজির হলো সাগরতীরে। এবার বনহুর নিজের কালো রুমাল বের করে বেঁধে ফেললো হিরন্ময়ের চোখ দুটো।

হিরন্ময়ের হাত দু'খানা তখন পিছমোড়া করে বাঁধা আছে। মিস রানীর চোখও বেঁধে দিলো বনহুর। তারপর কিছুদূর এগিয়ে আসার পর গাড়িতে চেপে বসলো।

গাড়ি ছুটে চললো।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পথের আশেপাশে কিছু নজরে পড়ছে না। গাড়ি চালাচ্ছে কে এবং গাড়ি কোন্‌দিকে যাচ্ছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। চুপচাপ বসে আছে হিরন্ময় সুবোধ বালকের মত।

মিস রীনাও নিশ্চুপ বসে আছে।

প্রায় তিন-চার ঘন্টা চলার পর থেমে পড়লো গাড়িখানা।

এবার বনহুর নেমে পড়লো গাড়ি থেকে, সঙ্গে সঙ্গে বললো—নামুন আপনারা।

এক্ষণে অবাধ্য হলে কোনো ফল হবে না বোঝে হিরন্ময় তাই, সে নীরবে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। রীনাও নামলো হিরন্ময়ের পিছনে।

গাড়ি থেকে নামতেই দু'জন লোক হিরন্ময়ের ও মিস রীনার হাত ধরে নিয়ে চললো। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা কেউ বুঝতে পারলো না।

যখন হিরন্ময় ও রীনার চোখ থেকে রুমাল খুলে দেওয়া হলো তখন তারা উভয়েই বিস্মিত হলো। তারা সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই ভূত দেখার

মত হকচকিয়ে গেলো। হিরন্ময় ও রীনা দেখলো সম্মুখে দণ্ডায়মান আংহাবারী, যাকে হিরন্ময় নিক্ষেপ করেছিলো সাগরবক্ষে।

হিরন্ময় ও রীনার চোখে শুধু বিস্ময় নয় তাদের দৃষ্টিপ যেন স্থির হয়ে গেছে, চোখের পাতা আর পড়ছে না, একি—আংহাবারীর মৃত্যু হয়েছে, অথচ তিনি কি করে এখানে এলেন! গভীর সাগরের পানিতে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, কেউ তাঁকে দেখতেও পায়নি।

বনহুর বললো—হিরন্ময়, তুমি আংহাবারীকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলে। কিন্তু তাকে এই মুহূর্তে জীবিত অবস্থায় দেখে হতবাক হয়েছো, তাই না? মিস রীনা, তুমিও কম অবাক হওনি! মনে রাখবে ইচ্ছা করলেই কাউকে হত্যা করা যায় না। বনহুর এবার মিস রীনাকে তুমি বলেই সম্বোধন করলো।

হিরন্ময় ঢোক গিললো।

রীনা নির্বাক হয়ে গেছে, কোনো কথা সরছে না তার মুখ দিয়ে—এ কি করে সম্ভব হলো, কি করে রক্ষা পেলেন এই বৃদ্ধ। আংহাবারীকে জীবিত অবস্থায় দেখে খুশিই হলো মিস রীনা। এতক্ষণ সে কোনো কথাই বলেনি, শুধু বনহুরের নির্দেশমত কাজই করেছে সে। বলেছে বনহুর, উঠুন! উঠেছে রীনা। বলেছে বনহুর বসুন! বসেছে সে। যা বলেছে তাই করেছে, এবার কথা বললো রীনা—জানি না আপনি কে, আপনার পরিচয়ও জানি না। সত্যি আমি অবাক হচ্ছি বৃদ্ধ আংহাবারী সাগবক্ষ থেকে কি করে উদ্ধার পেলেন?

বনহুর একটু হেসে বললো—এই মুহূর্তে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়, পরে সব জানতে পারবে।

আংহাবারীকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—আপনি যে লোককে বিশ্বাস করেছিলেন সেই লোকই আপনার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শুধু আপনাকে হত্যা করেই হিরন্ময় ক্ষান্ত হয়নি, সে আপনার ভাবী জামাতা মাহরুফকে সরিয়ে তার জায়গায় অপর এক যুবককে মাহরুফ সাজিয়ে আপনার কন্যা মিস মালাকে ধোঁকা দিয়েছে।

আংহাবারী চিৎকার করে উঠলেন—এসব আপনি কি বলছেন?

হাঁ, সব সত্য। এই নরাধম সবই করতে পারে, এরই ইংগিতে এসব ঘটেছে বা ঘটছে। এই হিরন্ময় শুধু আপনার সর্বনাশ করেনি সে বহুলোকের সর্বনাশ করেছে এবং তাদের প্রত্যেককে হত্যা করেছে সে, যেমন আপনাকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলো।

আংহাবারী বলে উঠলেন—আমার মালা তাহলে...—

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ বারী, যদিও মিস মালা এখনও সেই অপরিচিত যুববকে ভাবী স্বামী মনে করে তার সঙ্গে মেলমেশা করছে কিন্তু এখনও তাদের মিলন ঘটেনি বা বিয়ে হয়নি।

তবে আমাকে শিগ্‌গির সেখানে নিয়ে চলেন। আমার মালা ভুলও করতে পারে।

হাঁ, সে কারণেই আপনাকে আমি শীঘ্র সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার পূর্বে হিরন্ময়ের সঙ্গে আপনার কিছু কথাবার্তা রয়েছে। যেমন ধরুন আপনার কিছু ধনসম্পদ অর্থ সেই নকল মাহরুফের দ্বারা হিরন্ময় নিজে করায়ত্ত করেছে সেগুলো কোথায় আছে এবং কার কাছে আছে আপনার জানা দরকার। কথাগুলো বলে বনহুর হিরন্ময়ের দিকে ফিরে তাকালো—বললো তুমি মিঃ বারীর যে ধনসম্পদ এবং অর্থ আত্মসাৎ করেছিলে তা কোথায় আছে?

হিরন্ময় মাথা চুলকাতে শুরু করলো।

রীনা বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। ক্রমান্বয়ে বিস্ময় যেন আরও বাড়ছে তার। হিরন্ময় কি করছে না করছে সব যেন ইনি জানেন। এতসব জানলো কি করে? আংহাবারীর কন্যা মিস মালার জন্য হিরন্ময় যে চালাকি, যে চাল চেলেছে তা অতি গোপনীয়—তাও জানেন ভদ্রলোক, আশ্চর্য বটে!

বনহুর পুনরায় হিন্ময়কে লক্ষ্য করে বললো—হিরন্ময়, মিঃ বারীর যা তুমি হস্তগত করেছো তা কোথায় রেখেছো? জানি তোমার জাহাজে তা রাখোনি বা নীলসাগর তলে গুপ্ত স্বর্ণগুহাতেও রাখোনি। বলো কোথায় রেখেছো?

হিরন্ময় বুঝতে পারছে দস্যু বনহুরের কবল থেকে আর তার রক্ষা নেই তবু সে চুপ করে রইলো, বলবে না কিছুতেই।

এবার বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—বলো নাহলে তোমাকে এই মূহুর্তে শাস্তি দেওয়া হবে। যে শাস্তি তুমি বহু নিরীহ মানুষকে দিয়েছিলে। তোমার চোখ দুটোকে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা বিদ্ধ করে অন্ধ করে দেবো......

কথাগুলো বনহুর এমনভাবে বললো, এরপর হিরন্ময় নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। তাকালো সে আংহাবারীর দিকে।

আংহাবারী বললেন—বলো শয়তান, আমার যা তুমি হস্তগত করেছো তা কোথায় রেখেছো বলো?

হিরন্ময় বললো—সে ধনসম্পদের সন্ধান জানে আমি......

কিন্তু তোমাকেই বলতে হবে? বললো বনহুর।

হিরন্ময় কম চতুর নয়, সে মিথ্যা কথা বলে—আংহাবারীর যে ধনসম্পদ ও অর্থ আমার কাছে আছে তা শুধু আমিই জানি। আপনারা আমাকে নিয়ে চলুন, আমি দেখিয়ে দেবো। তা এমন এক গুপ্তস্থান যে জায়গার সন্ধান কেউ জানে না, এমন কি আমার অনুচররাও জানে না।

বনহুর বললো—মিস রীনাও না?

না, আমি কাউকে সে স্থান দেখাইনি। ফাংহা পর্বতের কোনো এক গোপন জায়গায় আমার ছোট একটা গুপ্তগুহা আছে।

কিন্তু মিথ্যা হলে?

না, মিথ্যা নয়......

বেশ, তাই যাবো—বনহুর হাতে তালি দেয়, অমনি বেরিয়ে আসে দু'জন লোক। তাদের মুখে মুখোস পরা ছিলো, কাজেই তারা কারা চেনা যাচ্ছিলো না।

মুখোসপরা লোক দু'জন আসতেই বললো বনহুর—আমার পর্বতারোহণ জীপগাড়িখানা এসে পৌঁছেছে কি?

একজন বললো—না মালিক, এখনও পর্বতারোহণ জীপ এসে পৌঁছেনি। জম্বু থেকে রামসিং জানিয়েছে দু'একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

তাহলে হিরন্ময়, আজ তোমাকে নিয়ে তোমার সেই গুপ্ত-গুহায় যাওয়া হলো না কিন্তু মনে রেখো যদি তোমার কথার একবর্ণ মিথ্যা হয় তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড নয়, তার চেয়েও ভয়াবহ শাস্তি আমি তোমাকে দেবো। তারপর অনুচরদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর—হিরন্ময়কে তার জন্য নির্দেশিত কক্ষে নিয়ে যাও। আর মিস রীনাকে নিয়ে যাও তার জন্য নির্ধারিত কক্ষে। মিঃ বারী, আপনি চলুন। আপনার কন্যা মিস মালার বিবাহ আগামীকাল ঠিক হয়েছে, তার পূর্বে আপনাকে সেখানে পৌঁছতে হবে এবং আসল মাহরুফকে আপনি নিজে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

মাহরুফ! কোথায় আছে আমার ভাবী জামাতা মাহরুফ?

হাঁ, তাকে আপনি পাবেন। ঐ হিরন্ময় কোনো এক গুপ্ত স্থানে তাকে আটকে রেখেছিলো তাকে আপনি এখুনি দেখতে পাবেন, কারণ তাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। নিয়ে এসো এবার মাহরুফ কে!

একজন অনুচর চলে গেলো এবং অল্পক্ষণেই মাহরুফসহ প্রবেশ করলো সেখানে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগলো হিরন্ময়ের মনে। ভীষণ আশ্চর্য হলো সে, কারণ মাহরুফকে এমন এক স্থানে আটকে রাখা হয়েছিলো যেখানে সাধ্য নেই কেউ প্রবেশ করে। সেই দুর্গম স্থান থেকে কিভাবে মাহরুফ ফিরে এলো বা তাকে মুক্ত করা হলো!

আংহাবারী তখন মাহরুফকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আনন্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তাঁর দু'গন্ড বেয়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি—মাহরুফ, একি চেহারা হয়েছে তোমার বাবা?

মাহরুফের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মলিন জামাকাপড়, চোখ বসে গেছে এবং চোখের নিচে কালো হয়ে উঠেছে।

মাহরুফ বললো—চাচা, আমাকে ওরা বন্দী করে রেখেছিলো এক অন্ধকারময় দরজা-জানালাবিহীন কক্ষে। আমাকে ওরা ঠিকমত খেতেও দেয়নি। আমি প্লেন থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক আমাকে জানোলো আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মালা আপনার শোকে মুহ্যমান, তাই তারা কেউ এরাড্রোমে আসতে পারেননি। আমি তার কথায় বিশ্বাস করি এবং তার সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসি। তারপর যা ঘটেছে অবর্ণনীয়।

বনহুর বললো—থাক, সে সব বলে এখন কোনো ফল হবে না।

মাহরুফ বলে উঠলো—তবু একটু আমাকে বলতে দিন। চাচা, সেই অন্ধকার দরজা-জানালাবিহীন কক্ষে আমি দিনের পর দিন মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছিলাম। এতদিন আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চলতো। শেষ পর্যন্ত আমার জীবনের কোনো আশা রইলো না। আমি যখন মৃত্যুকে সানন্দে আহ্বান জানাচ্ছি তখন দেবদূতের মত আবির্ভাব হলেন এই মহান ব্যক্তি......আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখিয়ে বললো—সেই মুহূর্তে ইনি যদি উপস্থিত না হতেন তাহলে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হতো। আমাকে প্রতিদিন যাতাকলে চাপ দেওয়া হতো, যখন যাতাকলে আমাকে চাপ দেওয়া হতো তখন আমার চোখমুখ কান-নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতো.......

আংহাবারী বললো—উঃ কি নির্মম নির্যাতন, কি ভয়ঙ্কর শাস্তি...কিন্তু কি অপরাধ তুমি করেছিলে বাবা যার জন্য ঐ নরপশু তোমার উপর এমন অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলো?

বনহুর বললো—পশুর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, পশু পশুই বটে, তাই সে বিনা কারণেই মানুষের উপর চালায় অমানুষিক উৎপীড়ন। যাও, হিরন্ময়কে নিয়ে যাও। মিস রীনা, তুমি এখন নিশ্চিন্ত, যাও বিশ্রাম করোগে। আমি মিঃ বারী ও তাঁর ভাবী জামাতাকে স্বস্থানে পৌছে দিয়ে ফিরে এসে তোমাকে তোমার আকাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবো।

বনহুরের অনুচরদ্বয় হিরন্ময় ও মিস রীনা সহ চলে গেলো। বনহুর এবার আংহাবারী এবং মাহরুফকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

পুরোন পোড়োবাড়ি।

আংহাবারী ও তাঁর জামাতাকে বাড়ির বাইরে আনার পূর্বে কালো কাপড়ে তাঁদের চোখ বেঁধে দেওয়া হলো। যখন তাঁদেরকে গাড়ির পিছনে বসানো হলো তখনও তাঁদের চোখ বাঁধা রয়েছে।

গাড়ি যখন অর্ধপথ অতিক্রম করলো তখন আংহাবারী ও তাঁর ভাবী জামাতা মাহরুফের চোখের রুমাল খুলে দিলো বনহুর।

আংহাবারী ও মাহরুফসহ বনহুর যখন আংহাবারীর ভবনে পৌঁছলো তখন বিয়ের মঞ্চে বসানো হয়েছে আলমার পাশে মালাকে।

নববধূর বেশে মালা।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বাইরে গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি এসে থামলো।

বাড়ির দারোয়ান মৃত মালিককে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আনন্দ চিৎকারে বাড়ি মুখর করে ছুটে যায় অন্তপুরে।

মুহূর্তে আংহাবারীর বাসভবনে সাড়া পড়ে গেলো। সবাই ছুটে এলো গাড়ির পাশে, আংহাবারীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখে সকলে আনন্দে আত্মহারা হলো। এমনকি, বিয়ের আসর থেকে ছুটে এলো মালা—বাবা, তুমি বেঁচে আছো?

বললো আংহাবারী—হাঁ মা, বেঁচে আছি। ভিতরে চলো, সব কথা বলবো তোমাদের কাছে।

আংহাবারীসহ সবাই ভিতরে চলে গেলো, বিয়ে স্থগিত রইলো তখন।

আংহাবারী বললেন— মা, এই সেই মাহরুফ, আমার ভাবী জামাতা......

মালার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে, তাকায় সে নিজের পাশে দন্ডায়মান বরবেশে সজ্জিত আলমার দিকে। আলমা লজ্জায় মাথা নত করে নেয়।

ঐ মুহূর্তে পালাতে যাচ্ছিলো আর্ম ও আরও দু'জন তার সঙ্গী। আর্মও কম আশ্চর্য হয়নি আংহাবারীকে দেখে, কারণ আংহাবারীকে সে নিজে জাহাজ থেকে ঠেলে সাগরবক্ষে ফেলে দিয়েছিলো। সেই ব্যক্তি কি করে জীবিত থাকতে পারে ভেবে পায় না আর্ম। তাছাড়া যে মাহরুফকে তারা দুর্গম অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রেখেছিলো, তাকেই বা তারা পেলো কি করে! হঠাৎ আর্মের দৃষ্টি পড়লো বনহুরের মুখে, সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল! তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য পিছু হটে পালাতে গেলো জানালা দিয়ে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর রিভলবার চেপে ধরলো আর্মের বুকে—খবরদার, পালাতে চেষ্টা করো না আর্ম।

আংহাবারী এতক্ষণ কন্যাকে বুকে চেপে ধরে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করছিলেন, এবার তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে আর্মের উপর।

অন্য সকলেরই দৃষ্টি তখন আর্মের দিকে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

আংহাবারী বলে উঠেন—মা মালা, এই সেই ব্যক্তি যে আমাকে বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো এবং জাহাজ থেকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করেছিলো হত্যার জন্যে।

আংহাবারীর আত্মীস্বজন, বাড়ির চাকর-নফর এবং কর্মচারীবৃন্দ সবাই আর্মকে ঘিরে ধরলো, তাকে তক্ষুণি পিটিয়ে হত্যা করবে তারা।

কিন্তু বনহুর বাধা দিলো, বললো সে—যে ক্ষতি সাধন এ করেছে তাতে একে যাতাকলে পিষে মারাই এর উপযুক্ত শাস্তি কিন্তু এখন একে আমি হত্যা করতে দিতে পারছি না, কারণ এর কাছে আরও একটা জরুরি সন্ধান আছে। সেই কাজ সমাধা হবার পর একে পরপারে পাঠানো যায়।

সবাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারও মুখে কোনো কথা সরছে না।

বনহুর বললো—আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, এই নরপশুকে বেঁধে ফেলুন। বিশেষ করে ওর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধুন।

বনহুরের আদেশ পালন করলো ওরা।

আর্মের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। ইচ্ছা থাকলেও কোনোরকম শক্তি প্রয়োগ করতে সাহসী হলো না আর্ম, কারণ সে জানে মিঃ আলমের শক্তির কাছে তার শক্তি সামান্য মাত্র। তাছাড়া তার চারপাশ ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু লোকজন, কাজেই সে নীরব রইলো।

এমন সময় এক বৃদ্ধ আত্মীয় এসে দাঁড়ালেন আংহাবারীর পাশে, তিনি বললেন—মাহরুফ যদি এই যুবক হয় তাহলে এই যুবক কে? বরবেশী আলমাকে দেখিয়ে দেন তিনি।

আংহাবারী বললেন—সব ঐ জুয়োচ্চোরের কাজ। আর্ম শুধু আমাকেই হত্যা করতে চেষ্টা করেনি, সে আমার ভাবী জামাতা মাহরুফকে সরিয়ে একজন নকল মাহরুফ এনে মালার সঙ্গে ওবয়ে দিয়ে আমার ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করতে মনস্থ করেছিলো। কিন্তু সব পণ্ড করে দিয়েছেন আমার জীবন রক্ষাকারী এই ভদ্রলোক যিনি আমাকে আমার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলেন এবং আজ মালার জীবনও বিনিষ্ট হওয়া থেকে তিনি তাকে রক্ষা করলেন। এই সামান্য সময়ে এবং এমন অবস্থায় এই মহান ব্যক্তির উপকারের সব কথা আমি বর্ণনা করে শোনাতে পারছি না। মা মালা, ওর কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ......

বনহুর বাধা দিয়ে বলে উঠলো—এবার আপনারা আসল মাহরুফকে ফিরে পেয়েছেন, এই বিয়ের অনুষ্ঠানেই মালা ও মাহরুফের বিয়ে সমাধা করুন। আর একটা অনুরোধ, আপনাদের কাছে এই যে, আর্ম যে যুবকটিকে মাহরুফ বানিয়ে মালার পাশে হাজির করে কার্যসিদ্ধ করতে চেয়েছিলো

আসলে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, চাকরি সন্ধানে সে এসেছিলো, আর্ম তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে তারপর মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে নকল মাহরুফ সাজাতে বাধ্য করে, তারপর যা ঘটেছে সবই তো আপনারা জানেন। আমি যে অনুরোধ করছি তা হলো নকল মাহরুফ বা আলমা এই যুবকের আসল নাম, একে আপনারা বিমুখ করে তাড়িয়ে দেবেন না। তাকে আপনাদের এখানে কোনো কাজ দেবেন যেন ওর কোন অভাব বা অসুবিধা না থাকে।

আংহাবারী মহৎ ব্যক্তি, তিনি অসহায় আলমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—আমার কোনো পুত্রসন্তান নেই। বাবা তুমি যখন খোদার ইঙ্গিতে এখানে এসেছো তখন আর যেতে দেবো না, আজ থেকে তুমি আমার সন্তান হলে। মালা তোমার ছোট বোন......

বনহুরের চোখ দুটো আনন্দ অশ্রুতে ভরে উঠলো, মুখে হাসি টেনে বললো—মিঃ বারী, সত্যিই আপনি একজন প্রকৃত মানুষ। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করবো না। আপনার মহত্বের কাছে আমি পরাজিত। কথাগুলো বলে ফিরে তাকালো বনহুর আর্মের দিকে, তারপর কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে বললো—চলো, এবার তোমার কাজ শুরু!

আর্মের পিঠে রিভলবার চেপে ধরে বেরিয়ে এলো বনহুর। সবাই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর আর্মসহ গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়ি উল্কাবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলো আংহাবারীর ফটক পেরিয়ে।

❑

আর্মসহ বনহুর যখন ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছলো তখন গভীর রাত। আংহাবারীর বাসভবন ছিলো ফাংহা শহরের ঠিক মাঝামাঝি, আর ফাংহা ডাকবাংলোটা ছিলো ঠিক শহর ছেড়ে এক প্রান্তে।

রাতের অন্ধকারে বনহুরের গাড়িখানা এসে থামলো ডাকবাংলোর অদূরে। আর্মকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে, এবার বনহুর বললো—নেমে এসো আর্ম।

বনহুরের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরকে অবহেলা করবার শক্তি ছিলো না আর্মের, অনুগত কুকুরের মত গাড়ি থেকে নেমে এলো সে।

বনহুর বললো—এসো।

বনহুর আগে আগে চললো, আর্ম তাকে অনুসরণ করলো, জানে সে পালাবার পথ তার নেই। হাত দু'খানা মজবুত করে বাঁধা পিছমোড়া করে,

কাজেই দৌড় দিয়ে পালাতে গিয়ে রিভলবারের একটা গুলী তাকে হজম করতে হবে। কাজেই আর্ম সুযোগের অপেক্ষায় বনহুরের পিছু পিছু ডাকবাংলো অভিমুখে রওনা দিলো।

আর্মের মনে তখন একটা চিন্তা আলোড়ন তুলেছিলো, সে হলো ক'দিন পূর্বে ডাকবাংলোয় রহমানের সঙ্গে ভীষণ বেঁধেছিলো তার। রহমানের কাছে পরাজিত হয়ে ভিজা শিয়ালের মত পালিয়ে গিয়েছিলো। আজ আবার তাকে সেই ডাকবাংলোয় ফিরে আসতে হচ্ছে। রহমান নিশ্চয়ই তাকে বিদ্রুপ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর্ম ভিতরে ভিতরে লজ্জা বোধ করছিলো।

ডাকবাংলোর নিকটে পৌছতেই রহমান দরজা খুলে দিলো। সে ভারী বুটের আওয়াজে বুঝতে পেরেছিলো তার সর্দারের বুটের শব্দ এটা। দ্রুত দরজা খুলেই সম্মুখে সর্দার ও তার আর্মকে দেখে বিস্মিত হলো।

বনহুর বললো—রহমান, আর্ম এসেছে, ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসাও।

বনহুর প্রবেশ করলো ডাকবাংলোর অভ্যন্তরে।

রহমানকে দেখে আর্ম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো। বললো রহমান—এসো বন্ধু!

অবশ্য ক'দিন আগে আর্মের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত রহমানের কাছে পরাজয় বরণ করে পালাতে বাধ্য হয়েছিলো সে, আজ এইভাবে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় মাথাটা তার নত হয়ে আসছিলো।

রহমানের কথায় বাধ্য হয়ে আর্ম প্রবেশ করলো ডাকবাংলোর মধ্যে।

বনহুর তখন মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো দেয়ালের দিকে মুখ করে।

রহমান ও আর্ম যখন মেঝের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো তখন বনহুর চট করে ফিরে তাকালো আর্মের দিকে, দক্ষিণ হাতে তার রিভলবারখানা বের করে নিয়েছে।

আর্মের বুকে রিভলবার চেপে ধরে বললো বনহুর—আর্ম, এবার বলো ঝুমা কোথায়?

আর্ম হকচকিয়ে গেলো যেন, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে বনহুরের দিকে।

বনহুর রিভলবারের নলটা আরও শক্ত করে চেপে ধরলো ওর বুকে—বলো শয়তান, ঝুমা কোথায়?

আর্ম ঢোক গিলে বললো—আমি জানি না।

গর্জন করে উঠলো বনহুর—মিথ্যে কথা! বলো নচেৎ এই মুহূর্তে তোমার জীবনলীলা সাঙ্গ হবে।

আর্ম রিভলবারের নলের দিকে তাকিয়ে বললো—যদি সত্য কথা বলি, তুমি আমাকে মুক্তি দেবে?

দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর—মিথ্যা বলে তোমাকে ধোঁকা দেবো না শয়তান। মুক্তি আর তুমি পাবে না তবে ঝুমার সঠিক সন্ধান যদি তুমি দাও তাহলে তোমাকে অন্য যন্ত্রণায় মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। বলো কোথায় ঝুমা?

আমি জানি না।

তাহলে এই মুহূর্তে মরতে চাও, বলো নরাধম?

এবার আর্মের হৃদয় কেঁপে উঠলো, বললো—যদি আমাকে মুক্তি দাও তাহলে আমি ঝুমাকে ফিরিয়ে দেবো, নাহলে আমাকে যে ভাবেই হত্যা করো না কেন আমি ঝুমাকে ফিরিয়ে দেবো না, ওর সন্ধানও বলবো না।

রহমান বললো—সর্দার, আর্ম বলেছে ঝুমা নাকি ডাকবাংলোতেই আছে।

ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকায় রহমান বনহুরের দিকে।

রহমান বললো—সর্দার, ক'দিন আগেই আর্মের সঙ্গে আমার মোকাবেলা হয়েছে। ঐ শয়তান কিছুতেই ঝুমার সত্যিকারের সন্ধান দেয়নি......

আজ আমি ওর কাছে সত্যিকারের সন্ধান চাই। চলো আর্ম, এক্ষুণি আমাকে নিয়ে চলো ঝুমার কাছে। যদি কোনোরকম চালাকি করতে যাও তাহলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। চলো কোথায় ঝুমা আছে দেখিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও ঝুমাকে......

আর্ম বললো—আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও তাহলে। আমার হাতে খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ পিছমোড়া অবস্থায় আমি এ বাঁধন সহ্য করতে পারছি না।

বনহুর খুলে দিলো আর্মের হাতের বাঁধন, বললো—চলো আমার সঙ্গে, ঝুমা যেখানে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে চলো।

আর্ম এগুলো।

বনহুর ও রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

একি, আর্ম সোজা এগিয়ে যাচ্ছে যে ছোট্ট কক্ষমধ্যে সে থাকতো সেইদিকে। বনহুর ও রহমান একবার উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। এই ছোট্ট কক্ষমধ্যে ঝুমা কোথায় আছে কে জানে?

আর্মের পিছনে বনহুর ও রহমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বিস্মিত হলো, কারণ কক্ষের মধ্যে পরিষ্কার নজরে পড়ছে একটা প্রাণীও নেই সে কক্ষের ভিতরে। ঝুমা কোথায় ভেবে পায় না বনহুর আর রহমান।

আর্ম দ্রুত ওদিকের আলমারীর দিকে এগিয়ে গেলো, তারপর পকেট থেকে বের করলো একটা চাবি। চাবি দিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেললো আলমারীটা।

বনহুর আর রহমান দেখলো একটা গলিত শবদেহ সঙ্গে সঙ্গে নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলো তারা। অসহ্য দুর্গন্ধ কক্ষটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

বনহুরের দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো, ঝুমার শেষ পরিণতি তাকে অত্যন্ত কাতর করে তুললো। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য, পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো বনহুর আর্মের ঘাড়টা। তারপর চালালো প্রচন্ড ঘুষি নাকে-মুখে-চোখে। আর্মের হাত খোলা ছিলো, সেও নিজকে রক্ষা করার জন্য পাল্টা আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুরও গলা চেপে ধরে, আরও কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় ওর নাকে। ওর নাকমুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে।

আর্ম মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাকে টেনে তুলে নেয়, তারপর আলমারীটার মধ্যে ঠেলে দেয় জোরপূর্বক, বন্ধ করে দেয় আলমারীর কপাটখানার ডালাটা, বন্ধ করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

ভিতর থেকে ভেসে আসে আর্মের আর্তনাদ—বাঁচাও... বাঁচাও... বাঁচাও...

বনহুর ভীষণভাবে অট্টহাসি হেসে উঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আর্ম, তোমার উপযুক্ত শাস্তি আমি দিতে সক্ষম হলাম।

রহমানের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বললো সে—সর্দার, আর্ম আপনাকে হত্যার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো। এবার শয়তান ঠিক শায়েস্তা হলো।

বনহুরের মুখ ম্লান, চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। উদাস কণ্ঠে বললো—আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলো আর্ম, তবু আমি তাকে হত্যা করতাম না। ঝুমা, অসহায়া ঝুমাকে সে হত্যা করেছে, তাই আমি ওকে কঠিন মৃত্যুদন্ড দিলাম।

❑

বনহুর পায়চারী করে চলেছে। ললাটে তার গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে, কি ভাবছে সে কেউ জানে না। হিরন্ময়কে বন্দী করে রেখেছে, আর্মকে ক্রোধান্ধ হয়ে হত্যা করেছে, নির্মমভাবে তাকে আলমারীর মধ্যে

আটক করেছে—যেমন করে আর্ম ঝুমাকে আটক করেছিলো। ঝুমার নিটোল দেহটা পচে গলে গেছে। তেমনিভাবে একদিন আর্মের দেহটা পচে গলে যাবে—উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে বনহুর আর্মকে। এবার হিরন্ময়—তাকে সায়েস্তা করতে পারলে তবে তার কাজ শেষ হবে। কিন্তু হিরন্ময়কে সায়েস্তা করার পূর্বে আরও কিছু কাজ বাকি আছে।

বনহুর সম্মুখের জানালার শার্শী তুলে তাকালো বাইরের দিকে।

তুষার পড়া শেষ হয়নি এখনও।

বাইরে ঝাপসা লাগছে খুব।

আকাশের নীল রং বা দূরের গাঁছপালা কিছু নজরে পড়ছে না। বনহুর তাকাচ্ছে, কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছে যেন সে।

বনহুর শার্শী বন্ধ করে ফিরে এলো বিছানার পাশে।

সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর শয্যায় গা এলিয়ে দিলো।

চারিদিকে নিস্তব্ধ, পথঘাট নির্জন।

সকাল থেকে আজ তুষারপাত হচ্ছে, কাজেই ফাংহাবাসী আজ বাইরে বের হবার সুযোগ পায়নি।

বনহুর কয়েকমুখ ধোঁয়া ছাড়ার পর উঠে দাঁড়ালো, হাতের অর্ধ দগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে ড্রেসিং টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো, পরে নিলো সে তার জমকালো ড্রেস।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বাইরে অশ্বপদশব্দ শোনা গেলো।

একটু পরই দরজায় টোকা পড়লো।

বনহুর বললো—কে রহমান?

হাঁ, সর্দার।

দরজা খুলে দিলো বনহুর।

রহমান ভিতরে প্রবেশ করলো, কুর্ণিশ জানালো সে, তারপর বললো—সর্দার, শুভ সংবাদ।

বলো?

হিরন্ময়ের সঙ্গে যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জড়িত আছে তাদের নাম-ঠিকানা বলেছে সে।

বলো কি রহমান?

হাঁ সর্দার, তবে হিরন্ময় ইচ্ছায় বলেনি, বলতে বাধ্য হয়েছে। তাকে তার নিজের যাতাকলে চাপ দিয়ে সব কথা বলতে বাধ্য করেছি।

কার কার নাম সে বললো?

তারা ফাংহার অধিবাসী এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি। হিন্ময়য় প্রথমে কিছুতেই তাদের নাম বলতে রাজি ছিলো না, কারণ সাধারণ ব্যক্তি এরা নয়......

আমি জানতাম রহমান।

রহমান একটা লিষ্ট বের করে বনহুরের হাতে দিলো—এই নিন সর্দার সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নামের লিষ্ট। যারা হিরন্ময়কে অসৎ ব্যবসায়ে সহযোগিতা করে এসেছে।

বনহুর রহমানের হাত থেকে লিষ্টখানা নিয়ে টেবিল ল্যাম্পে সম্মুখে তুলে ধরলো। মনোযোগ সহকারে লিষ্টখানাতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—ঘোলা জলের মাছ এরা।

ঘোলাজল!

হাঁ, ঘোলা জলের মাছ।

তার মানে?

আজ নয়, পরে সব জানতে পারবে।

সর্দার আপনি কি......

হাঁ, আমি এক্ষুণি বের হবো।

কিন্তু বাইরে ভীষণ কুয়াশা পড়ছে।

পড়তে দাও।

সর্দার!

বলো?

এই কুয়াশার মধ্যে আপনি পথ ভুল করে বসতে পারেন, কারণ আমি বারবার পথ ভুল করেছি।

এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একটু থেমে বললো বনহুর—লিষ্টখানা এনে খুব ভালো করেছো রহমান। এখন আমার পক্ষে কাজ করা অত্যন্ত সহজ হবে। রহমান, এখন হিরন্ময় কোথায় আছে?

হিরন্ময়ের জেটিকলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং যাঁতাকলে তাকে চাপ দিয়ে তার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়েছি। সর্দার, সাধুতার মুখোস পরে দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিরাই দুর্নীতি করে চলেছে......

রহমানের কথায় বনহুর হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ, এ কথা তুমি আজ বুঝলে রহমান?

সর্দার, আমি আগে থেকেই বুঝি কিন্তু ভেবেছিলাম......

ভেবেছিলে ফাংহায় বুঝি এ অনিয়ম, অনাচার নেই?

কতকটা তাই, কারণ শুনেছি সব দেশের নেতারা এক নয়। সর্দার, আমি আশ্চর্য হচ্ছি যারা দেশের রক্ষক তারাই ভক্ষক হয়ে সাধু সেজে দেশের জনগণকে নিঃশেষ করে চলেছে।

যে দেশে যাবে সে দেশেই আছে অনাচার-অনিয়ম, তবে পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেসব দেশে নেই কোনো দুর্নীতি-অন্যায় অনাচার। সে সব দেশ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলা যায়, জানো এমনও দেশ আছে যে দেশের দোকানে কোনো বিক্রেতা নেই অথচ জিনিস সাজানো আছে থরে থরে। গ্রাহক আসছে, যে বস্তু তাদের প্রয়োজন তুলে নিচ্ছে। বস্তুর গায়ে সঠিক মূল্য লিখা আছে, ক্রেতা প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং ন্যায্যমূল্য রেখে দেন দোকানের ক্যাশবাক্সে। আরও দেশ আছে যে দেশের হোটেল বা সরাইখানায় কোনো এমন লোক থাকে না যারা খাদ্য সরবরাহ করে। গ্রাহক বা খদ্দের আসে, যার যা খাবার প্রয়োজন খায়, খাবার পর বয় কাগজ-কলম নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। খদ্দের যা খেয়েছে তার সঠিক বিল লিখে দেয় বয়ের লিষ্টে এবং খাদ্যের মূল্য খদ্দের দিয়ে দেয় বয়ের হাতে।

সর্দার এমন দেশও আছে, এত ন্যায়নীতি সে দেশে?

হাঁ, আছে। সে দেশে কেউ কাউকে মেরে খায় না, কেউ কারও জিনিস ছিনিয়ে নেয় না। কেউ কারও সম্পদ দেখে লোভ করে না। সবাই চায় সবার মঙ্গল। কথার ফাঁকে বনহুর পুনরায় জানালার শার্শী ফাঁক করে দেখে নেয় বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তাটা।

রহমান বললো—সর্দার, সাবধানে অশ্বচালনা করবেন। পথ অত্যন্ত দুর্গম।

বনহুর পাগড়ীটা মাথায় তুলে দিয়ে রহমানকে লক্ষ্য করে বলে—চললাম, যতক্ষণ ফিরে না আসি অপেক্ষা করবে।

বনহুর কুয়াশাঘন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

রহমান দাঁড়িয়ে রইলো ডাকবাংলোর বারান্দায়।

বনহুরের অশ্বপদশব্দ কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রতিধ্বনি জাগালো খট খট খট। নিস্তব্ধ প্রান্তর পর্বতমালা আর ফাংহা নগরী প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সেই অশ্বপদশব্দ।

❑

লাইটপোষ্টের নিচে দাঁড়িয়ে বনহুর একবার দেখে নিলো রহমানের দেওয়া লিষ্টখানা। চোখ দুটো তার উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো। লিষ্টখানা পকেটে রেখে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো।

অশ্ব পা দুখানা উঁচু করে শব্দ করে উঠলো চিঁহি।

কুয়াশা এখন কিছু কম হয়ে এসেছে।

লাইটপোষ্টগুলো নির্জীব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে।

বনহুরের অশ্ব ছুটতে শুরু করলো।

পাথুরিয়া পথ।

অশ্ব খুরের শব্দ প্রকম্পিত করে তুললো কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের অন্ধকার।

ফাংহার একটা গোপন কক্ষে বসে কয়েকজন লোক গোপন আলোচনা করছিলো। সবার মুখেই উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান, তারা চাপ স্বরে আলোচনা করছিলো।

একজন বললো—হিরন্ময় বাবু সন্ধান আজও পাওয়া গেলো না। না জানি তিনি কোথায় আত্মগোপন করেছেন!

অপর একজন বলে উঠলো—এক সপ্তাহ হয়ে গেলো আমরা তাঁর প্রতীক্ষা করছি কিন্তু তিনি এলেন না—ব্যাপার যেন কেমন ঘোলাটে লাগছে!

তৃতীয় ব্যক্তি বললো—বাবু তো জাহাজে ফিরে যাননি?

প্রথম ব্যক্তি বললো—জাহাজে খোঁজ নিয়েছি, আজ কয়দিন যাবৎ বাবু জাহাজে যাননি।

চতুর্থ ব্যক্তি বললো—বাবা মাঝে মাঝে উধাও হন বটে, তাই বলে একেবারে এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকবেন এটা শুধু আশ্চর্যই নয়, একেবারে রহস্যজনক। নিশ্চয়ই তিনি নীলসাগর তলের গোপন সম্পদ নিয়ে সীমান্তের ওপারে সরে পড়েছেন।

পঞ্চম ব্যক্তি বললেন—ব্যবসা ছেড়ে তিনি সরে পড়বেন, এ কথা তোমরা ভাবতে পারলে? জাহাজের গুদামে আছে হাজার হাজার মণ মাল। তারপর শহরের গুদামে আছে বহু মাল যা অচিরে চালান যাবে। এখানে আছে বহু মাল—কোটি কোটি টাকার হবে, এসব মাল রেখে বাবু বিদায় নেবেন এটা মনে হয় না।

এমন সময় একজন লোক প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, সে বললো—নিথোল্ ঘাটি থেকে আমাদের সবগুলো লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

আগন্তুকের কথা শোনার পরই সবাই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। বললো প্রথম ব্যক্তি—নিথোল্ ঘাটিতে পুলিশ হানা দিয়েছিলো, বলো কি!

হাঁ নিশো, সত্যি এবং বেশ কয়েকদিন আগে এই ঘটনা ঘটে গেছে।

নিশো বললো—আশ্চর্য, আমরা কিছু জানি না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি লামাসু বললো—এত সাহস পুলিশ বাহিনীর, হিরন্ময় বাবুর ঘাটিতে হানা দেয়—নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র আছে এর পিছনে।

তৃতীয় ব্যক্তি মালো বললো—বাবুর পরিচয় পুলিশ বাহিনী পায়নি, তাই তারা হয়তো ভুল করেছে।

চতুর্থ ব্যক্তি জগাইলু বললো—লামসু যা বললো তাই ঠিক, ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে। বাবুকে নিশ্চয়ই কেউ সরিয়ে দিয়েছে, নাহলে পুলিশবাহিনী তাঁর ঘাটির উপর হামলা চালাতে সাহস পায়!

আগন্তুক রুম্‌উথ্‌ বললো—হয়তো আমাদের এখানেও পুলিশ হামলা চালাতে পারে।

বললো মালো—বিস্ময়কর কিছু না। এখানে আমাদের গুদামে যে শিশুখাদ্য এবং ফুড্‌ মজুত আছে তা প্রায় কয়েক কোটি টাকা! কাজেই বাবু যে এ সবের মায়া ত্যাগ করে হাওয়ায় উবে যাবেন, এমন হয় না। ব্যবসার কারণেই হয়তো তিনি কোথাও ডুব মেরেছেন।

বললো এবার জগাইলু—মালো, তুই যা বললি সত্যি কিন্তু কাল যে জাহাজ আসছে, সারা মাল বোঝাই করে ফিরে যাবে সীমান্তের ওপারে। ফাংহার মোহনায় আমাদের লোক আছে, তারা এই মাল বোঝাই জাহাজ পার করে দেবে।

কিন্তু বাবু তো এমন জরুরি সময় আত্মগোপন করে থাকতে পারেন না—তাঁর যে বহু কাজ!

বললো অপরজন—কাজ নিয়েই তো সরে আছেন তিনি। অন্তরালে থেকে কাজ করছেন, বুঝলে? কাল মাল নিয়ে জাহাজ ছাড়বার পূর্বে ছোটবাবু থাকবেন।

বললো নিশো—ছোট বাবু আজই আসবেন বলেছেন।

নিশোর কথা শেষ হয় না, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ছোটবাবু, নাম তার হররাম কিষন। বিরাট ভুড়িওয়ালা লোক, মাথায় কিছুটা টাক পড়েছে। বয়স হিরন্ময়ের চেয়ে দু'এক বছরের ছোট হবে।

হররাম হিরন্ময়ের অংশীদার। সবগুলো ব্যবসার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সে। বললো সে—নিশো, জরুরি একটা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলাম। হিরন্ময়কে কে বা কারা পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।

একসঙ্গে অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো কক্ষমধ্যে সবাই—বড়বাবু পাকড়াও হয়েছেন! বলেন কি ছোট বাবু?

বললো হররাম—হাঁ, আমি সংবাদটা জানতে পেরে ছুটে এলাম। নিশো, মোটেই বিলম্ব করা উচিত হবে না। এই কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের অন্ধকারে আমাদের সব মাল এখন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

ছোটবাবু, মাল তো কাল যাবার কথা আছে? বললো লামাসু।

ছোটবাবু বললো—হাঁ, সেই রকম কথা ছিলো এবং সেইভাবে আমাদের জাহাজ প্রস্তুত আছে। মাল জাহাজে পৌছলেই জাহাজ ফাংহা বন্দর ত্যাগ করবে।

রমউথ বললো—ছোটবাবু, আপনাদের চেনে না এমন লোক ফাংহায় আছে নাকি! সবাইতো আপনাদের হাতের মুঠায়......

মাল নিয়ে বিপদে পড়লে পুলিশমহল সাহায্যই করবে, কারণ তারা যখন জানতে পারবে এ মালামাল তাদেরই হর্তাকর্তাদের এবং এ মাল বন্ধুরাষ্ট্রে যাচ্ছে। যে বন্ধুরাষ্ট্র সর্বতোভাবে সাহায্য করে এসেছেন, সেই বন্ধুরাষ্ট্রের জন্য দেশের সব ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতেও আমরা রাজি আছি......

চুপ করো মালো, এসব বড় গোপন কথা। যদি ঐ নচ্ছার পুঁচকে মানুষগুলো জানতে পারে আমরা এখনও গোপনে তাদের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি, তাহলে রক্ষা থাকবে না। আমাদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে, তাছাড়া আমরা হেয় হয়ে যাবো, বুঝলে?

ছোটবাবু রুমালে মুখ মুছে বললো—আর বিলম্ব করা ঠিক হচ্ছে না, মালগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের অন্ধকারে গাড়িতে তুলে দাও।

বললো লিমো—এত মাল এক রাতে সরানো সম্ভব হবে কি ছোটবাবু?

বিপদ আমাদের সম্মুখে, কারণ সত্যিই যদি বড়বাবু কোথাও পাকড়াও হয়ে থাকে তাহলে তার ব্যবসাকেন্দ্রগুলোও রক্ষা পাবে না।

ছোটবাবু এত ভয় করছেন কেন, পুলিশের কর্মকর্তাগণ তো আমাদের হাতের পুতুল......

আমার মনে হয় নিশ্চয়ই বড়বাবুকে পুলিশ মহল আটক, করেনি নতুন কোনো দল তাকে শায়েস্তা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে......

তোমার অনুমান সত্য বন্ধু, পুলিশ মহল তোমাদের হাতের পুতুল কিন্তু শুধু পুলিশ মহলকেই পুতুল বানিয়ে কার্যোদ্ধার হবে না! দেশের জনগণ তোমাদের হাতের পুতুল নয়, কাজেই তারা তোমাদের ক্ষমা করবে না। এবার তোমাদের পিছু লেগেছে যারা, তারা মানুষ...

কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে এলো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

আড়ষ্ট হয়ে যায় কক্ষে যারা ছিলো সবাই। তারা বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো জমকালো পোশাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, তার দু'হাতে দুটো রিভলবার।

বললো বনহুর—একচুল নড়বে না, নড়েছো কি মরেছো।

বনহুরের জমকালো পোশাক এবং তার কঠিন কণ্ঠস্বরে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সবাই। এ ওর মুখে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো।

ছোটবাবুর মুখ মরা মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তার মনে ভীষণ একটা ভীতিভাব জেগে উঠেছে, ভাবছে এই কি সেই ব্যক্তি যে তাদের বড়বাবুকে পাকড়াও করেছে? নিশ্চয়ই সেই হবে, নাহলে এই অজানা

গোপন কক্ষে এ এলো কি করে? কেউ তো এই গোপন কক্ষের সন্ধান জানে না।

বনহুর দু'পা এগিয়ে এলো, তার দু'হাতে দুটো রিভলবার। রিভলবারের আগা স্থির হয়ে আছে দুস্কৃতিকারীদের বুক লক্ষ্য করে।

দুস্কৃতিকারীরা পালাবে, না আক্রমণ করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ছোটবাবু ইংগিত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিশো ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর প্রচন্ড এক লাথি দিয়ে তাকে ধরাশায়ী করলো। ভারী বুটের আঘাত তার তলপেটে লেগেছিলো তাই নিশো চট করে উঠতে পারলো না, কিছুক্ষণ সে পড়ে রইলো মেঝেতে।

বনহুর ছোটবাবুকে লক্ষ্য করে বললো—অহেতুক মৃত্যুবরণ করবে না। যত মাল আছে ফাংহার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো তাহলে রক্ষা পাবে। আর যদি কোনোরকম চালাকি করতে যাও তাহলে আমার রিভলবার ক্ষমা করবে না তোমাদের কাউকে।

কিন্তু এ মাল যে আমার একার নয়, হিরন্ময় বাবু ও আমাদের কয়েকজন মিলে......

যাদেরই হোক না কেন, আমি তা শুনতে চাই না। কাল সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে এই মাল ফাংহার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, অন্যথায় মৃত্যু মনে রেখো। পুনরায় বনহুর স্মরণ করিয়ে দিলো, তারপর বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

নিশো উঠে দাঁড়ায়ে তখন শরীর থেকে ধূলো ঝেড়ে ফেলছিলো।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই ছোটবাবু উঁকি দিলো দরজার বাইরে। কক্ষটা ছিলো ঠিক একটা উঁচু জায়গায়। দরজা দিয়ে উঁকি দিলে বাইরে স্পষ্ট দেখা যায়।

ছোটবাবু উঁকি দিলো বটে, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। শুধু কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের অন্ধকার। কানে ভেসে এলো অশ্বপদশব্দ খট্ খট্ খট্।

হিলড্রগ পর্বতের গা বেয়ে যে সরু পথটা চলে গেছে শহরের দিকে, সেইদিকে বনহুর অশ্ব চালনা করলো। নিচে গভীর খাঁদ, হিলড্রগ ফাংহার সবচেয়ে দুর্গম গিরীপথ।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রিসিভার তুলে নিলো, ফোন করলো তার কোনো গোপন স্থানে।

ফাংহার একজন নামজাদা ব্যক্তির টেবিলে ফোন বেজে উঠলো। তিনি তখন তাঁর বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গল্পসল্প করছিলেন। টেবিলে শরাবপাত্র এবং বোতল রয়েছে।

ফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে নিলেন তিনি হাতে, কানে ধরতেই চোখ দুটো তাঁর বড় হয়ে উঠলো, বললেন—কি বললে, আমাদের মালগুদামে ডাকাত......তাহলে কি......সব নিয়ে গেছে......

ওপাশ থেকে ভেসে এলো ছোটবাবুর গলা—সব সে নিয়ে যায়নি...তবে বলে গেছে কাল সকালে গুদামের সব জিনিস যদি ফাংহার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে না দেই তাহলে কারও রক্ষা থাকবে না...এমন কি মৃত্যু অনিবার্য......

নামী ব্যক্তির মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বিদ্রুপভরা কণ্ঠে বললেন—মৃত্যু অনিবার্য...হাঃ হাঃ হাঃ...অমন করে সবাই ভয় দেখিয়েই থাকে...কারও সাধ্য আছে আমাদের মাল আটক করে বা দুঃস্থ লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়...আমরাই হলাম ফাংহার অধিনায়ক...পুলিশবাহিনীকে জানিয়ে দিন ব্যাপারটা...আর শুনুন ভোর হবার পূর্বেই মালগুলো গুদাম থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করুন...ডাকাত বেটা যেন মনে করে সব মাল দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে......

......কিন্তু আপনি ব্যাপারটা যত সহজ মনে করেছেন তত সহজ নয়...সে সাধারণ ডাকাত নয়...তার চেহারা অত্যন্ত অসাধারণ। আরও একটা দুঃসংবাদ আছে...

...দুঃসংবাদ!

...দুঃসংবাদ বড় দুঃসংবাদ, মিতাজী হিরন্ময় বাবুকে কে বা কারা উধাও করেছে।

...বলেন কি ছোটবাবু?

...হাঁ, সত্য এ সংবাদ। আজ ক'দিন যাবৎ তিনি কোনো ব্যবসা কেন্দ্রে আসেননি এবং জাহাজেও যাননি।

...মিস রীনা?...তার সংবাদ কি?...

...মিস রীনাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না....

...মিস রীনাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তবে কি মিস রীনার ষড়যন্ত্র এটা?...

...হয়তো তাও হতে পারে, কারণ কিছুদিন যাবৎ মিস রীনা বেশ বিগড়ে গিয়েছিলো বলে বড়বাবু জানিয়েছিলেন...

আমারও তাই মনে হচ্ছে...যাকে আপনি ডাকাত বলে মনে করেছেন সেই হয়তো বড়বাবুকে সরিয়েছে এমনও তো হতে পারে...

অসম্ভব কিছু নেই, কারণ ডাকাত সাধারণ ডাকাত নয় বলেই মনে হলো....তবে কি করবো বলুন...মালগুলো কি......

...ভোর রাতে গাড়ি যাচ্ছে, আপনি সেই গাড়িতে তুলে দিন। জাহাজ ফাংহা বন্দরে অপেক্ষা করছে। মালগুলো জাহাজে পৌছলেই সব কাজ সমাধা হবে...ডাকাত কেন, ডাকাতের বাবাও এর সন্ধান পাবে না...আমি এক্ষুণি পুলিশ প্রধানের কাছে ফোন করে দিচ্ছি, যেন কিছু পুলিশ মালগুলো পারাপারের সময় সাহায্য করে...

ছোটবাবু এতক্ষণে ভরসা পেলো, সে তার দলবলকে মালামল রাতের অন্ধকারেই গুদাম থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো।

ফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গে গুদামের মালামাল গাড়ি বোঝাই হলো। তারপর গাড়িগুলো রাতের অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন কোনো এক গোপন পথ বেয়ে এগিয়ে চললো তাদের অপেক্ষমান জাহাজখানার দিকে।

বনহুর জানতে পারলো তার কথামতো কাজ করেনি হিরন্ময়ের অংশীদার ছোটবাবু, তারা গুদামের মাল পার করে দিয়েছে গাড়ি বোঝাই করে।

বনহুর তার ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্রে জানিয়ে দিলো তার ফাংহার নতুন ঘাটিতে, যেখানে বনহুরের অনুচরগণ অপেক্ষা করছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে রহমানের কাছেও জানিয়ে দিলো বনহুর সংবাদটা।

রহমানের নিকটেও রয়েছে ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র, কাজেই সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গে রহমান বেরিয়ে পড়লো তার গাড়িখানা নিয়ে। কুয়াশা ততক্ষণে অনেকটা হালঙ্কা হয়ে এসেছে, গাড়িখানা উল্কাবেগে ছুটলো।

তাদের ফাংহা ঘাটিতে পৌছতে বেশি বিলম্ব হলো না রহমানের।

রহমান পৌছে দেখলো তাদের অনুচরবৃন্দ সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। গাড়িতে চেপে বসলো সবাই, এবার গাড়িখানা বেগে ছুটলো ফাংহা বন্দর অভিমুখে।

বন্দর থেকে কিছু দূরে নির্জন পথের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা।

রহমান ঠিক জায়গায় পৌছে ওয়্যারলেসে সর্দারকে জানিয়ে দিলো তারা কোন্ জায়গায় অবস্থা করছে।

বনহুরের পৌছতে বিলম্ব হলো না, সে দ্রুত অশ্বচালনা করে পৌছে গেলো এবং মিলিত হলো তার অনুচরদের পাশে।

বনহুর বললো—তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, মালগুলো জাহাজে তুলে নেওয়ার পর পরই তোমরা জাহাজে উঠে পড়বে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তোমরা কাজ করবে, মালসহ জাহাজখানা আমি কিছুতেই ছেড়ে দেবো না। যখন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করবে তখন জাহাজখানাকে সিংহা দ্বীপ অভিমুখে চালনা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

রহমান বললো—সিংহা দ্বীপ?

হাঁ রহমান, সিংহা দ্বীপের জনগণ অত্যন্ত দুঃখী। এই দ্বীপে কোনো খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। জাহাজে যে খাদ্য ও বেবী ফুড রয়েছে তা দিয়ে এই দ্বীপবাসীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

জাহাজে মালামাল উঠানো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সংবাদ পেয়ে গেলো। বনহুর নিজে গাড়ি চালনা করে দলবল সহ রওয়ানা দিলো। তারা যেখানে অপেক্ষা করছিলো সেখান থেকে বন্দর বেশি দূরে নয়, কাজেই বনহুর দলবলসহ পৌঁছে গেলো অল্পক্ষণের মধ্যেই।

জাহাজ সবেমাত্র বন্দর ত্যাগ করবে, ঐ মুহূর্তে বনহুর দলবল সহ জাহাজে উঠে পড়লো। বনহুর নিজে রিভলবার হাতে নিয়ে জাহাজের চালকের সম্মুখে হাজির হলো।

জমকালো পোশাকপরা লোক এবং হাতে আগ্নেয় অস্ত্র দেখে শিউরে উঠলো জাহাজের চালক, সে কোনো কথা বলতে গেলে বনহুর সাবধান করে দিলো—যেভাবে জাহাজ চালিয়ে চলেছো সেইভাবে চালিয়ে চলো, নাহলে এই অস্ত্র দেখছো, এটা ব্যবহার করবো।

চালক আড়ষ্ট হয়ে যান, মুখে কোনো কথা বের হয় না তার, সে বনহুরের কথামতো জাহাজ চালনা করে চললো।

রহমান ও তার দলবল বনহুরের নির্দেশমত কাজ করে চললো। রহমান সোজা ক্যাপ্টেনের পাশে গিয়ে তার পিস্তল উদ্যত করে ধরলো, বললো—খবরদার, কোনোরকম শব্দ উচ্চাবণ করবেন না, করলে মারা পড়বেন।

ক্যাপ্টেন হতভম্ব হয়ে পড়লেন, তিনি কোনো কথা না বলে নিজের কাজ করে চললেন।

এমনভাবে প্রতিটি ব্যক্তির পাশে এক একজন করে অস্ত্রধারী অনুচর এসে দাঁড়ালো, কেউ যেন কোনো রকম টু শব্দ করতে না পারে বা জাহাজ থামিয়ে না ফেলে।

জাহাজ এগিয়ে চললো।

বনহুর এবার চালককে পথের নির্দেশ দিতে লাগলো। চালক তো অবাক, ক্যাপ্টেন থ' মেরে গেছেন। অবশ্য তারাও এক একজন কম শক্তিশালী নয়, কিন্তু তারা মনের দিক থেকে দুর্বল, কারণ তারা ন্যায়কাজে নিয়োজিত ছিলো না, তারা চোরামাল কালোবাজারী করার জন্য সীমান্তের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যায় কাজে যারা নিয়োজিত, তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, মনের দিক থেকে তারা দুর্বল। যাঁরা মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের

দেহের শক্তির চেয়ে মনের শক্তি অসীম, কাজেই তাঁরা যে কোনো কাজে জয়লাভ করেন।

বনহুরের অনুচর সবাই যে শক্তিশালী ছিলো তা নয়, কিন্তু তাদের মনোবল ছিলো অত্যধিক তাই তারা সামান্য অস্ত্র নিয়েও একএকজন বলিষ্ঠ চোরাচালানী বীরদের কাবু করে রাখলো।

জাহাজখানা সাগরবক্ষে বহুদূর এগুনোর পর বনহুরের নির্দেশমত সিংহ দ্বীপ অভিমুখে ছুটতে লাগলো। কারও মুখে কোনো কথা সরলো না, সবাই অস্ত্রের ভয়ে কাজ করে চললো।

ছোটবাবু বসে আছে নিশ্চিন্ত মনে, সে ভাবছে তার পাঠানো মাল চলে গেছে গন্তব্যস্থানে। ডাকাত এলে বলবে সে, সব মালামাল তারা ফাংহার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

ছোটবাবু তার দলবল নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করে চললো। চললো শরাব পান আর গান বাজনা। ওদিকে তখন তাদের পাঠানো মালামাল সহ জাহাজখানা এসে ভিড়লো সিংহা দ্বীপে।

জাহাজ দেখামাত্র অগণিত দ্বীপবাসী এসে জাহাজের ধারে সমবেত হলো। উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ জীর্ণশীর্ণ সব মানুষগুলো, যেন এক একটা জীবন্ত কঙ্কাল। শুধু সিংহা দ্বীপ নয়—এমনি আরও বহু দ্বীপ আছে, যে সব দ্বীপে মানুষ বাস করে বটে কিন্তু তারা ঠিক পশুর মতই কাল কাটায়। এসব দ্বীপে খাদশস্য তেমন জন্মায় না, এসব দ্বীপবাসীরা ছিপনৌকা নিয়ে সাগরের বুকে মাছ ও পাখি শিকার করে জীবনধারণ করে। কোনো জাহাজ কোনোদিন ভুল করেও এ পথে আসে না। সভ্যসমাজের মানুষ কেমন, কেমন তাদের আচার-ব্যবহার, কিছু তারা জানে না। মানুষ হয়েও তারা মানুষের মত জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত।

আজ তারা জাহাজ দেখে এগিয়ে এলো সবাই। সবার চোখে মুখে আশ্চর্যভাব ফুটে উঠেছে। সাগরতীরে জাহাজটাকে ঘিরে ধরলো সবাই।

বনহুর নির্দেশ দিলো সব মাল জাহাজ থেকে নিচে নামানোর জন্য।

বনহুরের অনুচরগণ কাজ শুরু করলো।

যারা জাহাজে ছিলো তারাও বাধ্য হলো বনহুর ও তার অনুচরগণকে সাহায্য করতে।

বনহুর নিজহাতে শিশুখাদ্য এবং অন্যান্য বস্তু বিলিয়ে দিতে লাগলো সিংহা দ্বীপের দুঃস্থ অধিবাসীদের মধ্যে। সমস্ত দিন চলে গেলো এই কাজে।

একসময় জাহাজ খালি হয়ে এলো।

সিংহা দ্বীপের দুঃস্থ নর-নারী-বৃদ্ধ-শিশু সবার মুখে হাসি, সবাই খুশি হয়ে ফিরে গেলো নিজ নিজ বাসস্থানে। আনন্দ ওদের ধরে না, না জানি এরা কারা যারা তাদের মধ্যে এত মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করলো।

মাতা তার সন্তানদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো, পিতার চোখে খুশির উচ্ছ্বাস, তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে পেট পুরে খেতে পারবে, শুধু একদিন দু'দিন নয়, চলবে কয়েকদিন। একসঙ্গে এত খাদ্যদ্রব্য এরা কোনোদিন পায়নি। এত খাবার এ যেন তাদের কল্পনার অতীত।

সবাই যখন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তখন বনহুর এক বৃদ্ধাকে একপাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো—বুড়ীমা, তুমি কিছু নিচ্ছোনা কেন?

বৃদ্ধা আঁচলে চোখ মুছে বললো—বাবা, আমি ওসব নিয়ে কি করবো? আমার একমাত্র ছেলে, সে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঝড়ের রাতে ভাঙ্গা নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো মাছ ধরে এনে বিক্রি করে পয়সা পাবে, তাই দিয়ে খাবার কিনে খাবে কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হয়নি। বাছা আমার আর ফিরে আসেনি। নৌকাডুবি হয়ে বাছা আমার মারা পড়েছে। কি হবে বাবা খাবার নিয়ে.......বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো।

বনহুর বৃদ্ধার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—কেঁদো না মা, তোমার ছেলে গেছে তাতে দুঃখ কি! মনে করো আমি তোমার ছেলে!

সত্যি বলছিস্ বাপ, তুই আমার ছেলে হবি?

হাঁ বুড়ীমা, সত্যি বলছি।

তুই যাবি আমার ঘরে?

যাবো! চলো তোমার খাবার নিয়ে আমি বয়ে দিয়ে আসি তোমার বাড়িতে।

বনহুর বেশ কিছু খাবার নিয়ে বৃদ্ধাকে বললো—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো বুড়ীমা।

বৃদ্ধার চোখ দুটো খুশিতে ভরে উঠলো, সে বনহুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

আগে আগে চলেছে এক অসহায়া বৃদ্ধা, আর তাঁর পিছনে পিছনে চলেছে দস্যুসম্রাট বনহুর বৃদ্ধার খাদ্যবস্তুর পুঁটলি বহন করে নিয়ে—অপূর্ব এ দৃশ্য!

শনের কুটিরে বৃদ্ধা বাস করে, ছোট্ট সে কুটির—বৃদ্ধা বনহুরকে নিয়ে পৌঁছে গেলো কুটিরের পাশে।

বনহুর কাঁধ থেকে পুঁটলিটা নামিয়ে রাখলো দাওয়ায়। বৃদ্ধা খুশি হয়ে একটা পিঁড়ি পেতে দিলো, দিয়ে বললো—বসো বাবা।

বনহুর বসলো।

বৃদ্ধা বললো—কতদিন হলো বাছা আমার হারিয়ে গেছে, কেউ আমাকে মা বলে ডাকে না! কত দুঃখ আমার বুকে, কেউ খেতে বসে না—বাবা তুই খাবি? চারটি কিছু খাবি?

না, আজ আমি কিছু খাবো না বুড়ীমা, আবার আসবো তখন তুমি যা দেবে খাবো।

ঠিক আসবি তো বাবা?

হাঁ, আসবো।

বনহুর বিদায় নিয়ে চলে আসে।

বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে থাকে ওর পথের দিকে তাকিয়ে, চোখ দুটো ওর ভরে উঠে অশ্রুতে। ভাবে বৃদ্ধা, এমনি করে তার ছেলে যেতো, ঐ পথ দিয়েই সে যেতো মাছধরা জাল কাঁধে নিয়ে। শেষবারও সে ঐ পথে গিয়েছিলো কিন্তু আর সে ফিরে আসেনি।

বনহুর ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

জাহাজ সিংহা দ্বীপ ত্যাগ করে যখন ফিরে চললো তখন অসংখ্য দ্বীপবাসী হাত নেড়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগলো।

বনহুরের পাশেই মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। বনহুর তাকে লক্ষ্য করে বললো—দেখছেন ক্যাপ্টেন, সিংহা দ্বীপের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি দেখছেন। ঐ সব ধনকুবেরের ঐশ্বর্য এই হাসির কাছে ম্লান হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন, আপনাদের জাহাজে যে কোটি কোটি টাকার খাদ্যসম্ভার ছিলো আজ তা সঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ওসব খেয়ে বাঁচবে। বলুন, বলুন ক্যাপ্টেন কোনটি শ্রেয়? ধনকুবেরের ঐশ্বর্য না দুঃস্থ জনগণের মুখের হাসি?

ক্যাপ্টেনের মনে ভেসে উঠলো তাঁর নিজের জীবনের ছবিগুলো। ছোট্ট গ্রাম হিজলা, সেখানে কোনো এক কৃষকের ঘরে তার জন্ম। ছোট্ট পরিবার—তিনি, বাবা আর মা। বাবা জমি চাষ করতেন, যা ফসল ফলতো তা দিয়ে গোটা বছর সংসার চলতো না, তাই গ্রামের ধনকুবের নিজাম রিজভীর কিছু জমি তাঁর বাবা চাষাবাদ করতেন বর্গা হিসেবে। মনে পড়ে ক্যাপ্টেন জাহেদীর...এক বছর ভাল ফসল না হওয়ার দরুন তাঁর বাবা ধনকুবের নিজাম রিজভীকে অর্ধেক ফসল দিতে না পারায় তাঁকে ধরে নিয়ে যায় কাচারী বাড়িতে। তারপর সেকি নির্যাতন চলে তাঁর উপর। নিষ্ঠুর রিজভীর কষাঘাতে জর্জরিত করে তোলে তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে। এত ঐশ্বর্য তবু রিজভীর মন ভরে না, আরও প্রয়োজন তার। গরিব অসহায় পিতার করুণ

অবস্থা জাহেদীকে অস্থির করে তোলে। তিনি তখন চৌদ্দ বছর বয়সের তরুণ। বেরিয়ে পড়লেন জাহেদী চাকরির সন্ধানে, সেদিন ঘরে একমুঠা চাল ছিলো না যে তার মা ভাত রান্না করে দেন। মা নীরবে চোখ মুছেছিলেন সেদিন, সন্তানকে একমুঠো খেতে দিতে না পারায়। সব মনে আছে স্পষ্টভাবে জাহেদীর। আজ বনহুরের কথায় তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মার কথাই স্মরণ হলো, চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো তার বাবা-মার মুখ। আজ দীর্ঘকাল হলো তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তবু ভোলেননি জাহেদী তাঁদের কথা।

আজ জাহেদী ক্যাপ্টেন হয়েছেন। অসৎ উপায়ে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু ভোলেননি সেদিনের কথা, ভোলেননি দুঃস্থ মা-বাবার কথা।

বললো জায়েদী—আমাকে ক্ষমা করো ভাই, আমি যা করেছি তা বড় ভুল করেছি। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করেছি। তুমি কে জানি না, তবে তুমি যে একজন মহৎ ব্যক্তি এতে কোনো ভুল নেই। আজ আমাকে তুমি যে দীক্ষা দিলে, তার জন্য আমি চিরদিন তোমার কাছে ঋণী থাকবো।

বনহুর মুগ্ধ হলো ক্যাপ্টেন জাহেদীর কথায়, বললো—ন্যায়ভাবে কাজ করবেন যাতে অপরের কোনো ক্ষতি সাধন না হয়। বরং অপরের দুঃখ কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করবেন, এতে মনে তৃপ্তি পাবেন, শান্তিও আসবে জীবনে।

ক্যাপ্টেন বললেন—তুমি যা বলছো সত্য! আমি অন্যায়ভাবে বহু অর্থ উপার্জন করেছি, বহু ঐশ্বর্য আমার হয়েছে কিন্তু মনে আমার সত্যিকারের তৃপ্তি বা শান্তি পাইনি কোনোদিন। যখনই খেতে বসেছি তখনই মনে পড়েছে যা খাচ্ছি তা শত শত দুঃস্থ মানুষের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যখনই বিশ্রাম করতে শয্যা গ্রহণ করেছি তখনই মনে পড়েছে এ শয্যা যে অর্থে তৈরি হয়েছে, সে অর্থ আমার ন্যায্য উপার্জিত অর্থে নয়, কাজেই আমি শয্যা গ্রহণ করেও মনে আনন্দ বা সুখ পাইনি। আজ তুমি যে পথ আমাকে দেখিয়ে দিলে আমি সেই পথে এগিয়ে চলবো।

বনহুর ক্যাপ্টেন জাহেদীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

জাহেদীর সঙ্গে করমর্দন করলো বনহুর।

❑

কথাটা এক সময় ছোটবাবুর কানে গেলো। হিরন্ময়ের অনুচরগণ সবাই জানতে পারলো তাদের যে মালামাল সীমান্তের ওপারে পাঠানো হয়েছিলো তা সব খোয়া গেছে। শূন্য জাহাজ ফিরে এসেছে ফাংহা বন্দরে।

ক্রোধে জ্বলে উঠলো ছোটবাবু। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিয়ে ফোন করতে গেলো কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তির কাছে, কিন্তু রিসিভার তার হাতেই রয়ে গেলো, একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো তার পিঠে।

ছোটবাবুর ফোন করা আর হলো না, রিসিভার খসে পড়লো তার হাত থেকে। একটা গোঙ্গানির শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে....এ্যাঁ......এ্যাঁ...এ্যাঁ... টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো ছোটবাবু।

স্বনামধন্য ব্যক্তি রিসিভার তুলে নিয়েছিলো হাতে, ঠিক ঐ মুহূর্তে ওপাশ থেকে ছোটবাবুর গোঙ্গানির শব্দ ভেসে এলো। স্বনামধন্য ব্যক্তির মুখ ফ্যাকাশে হলো, তবে তা ক্ষণিকের জন্য, তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

ততক্ষণে তাঁর পাশে দন্ডায়মান সহকারী অনুমানেই সব বুঝে নিলেন এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি রিসিভার রাখার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কি কোনো অঘটন ঘটেছে স্যার?

বললেন মহামান্য মহান ব্যক্তি—হাঁ, সর্বনাশ হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে ছোটবাবুর কোনো বিপদ ঘটেছে। নিশ্চয়ই তাকে কোন ব্যক্তি নিহত করছে, কারণ আমি টেলিফোনে তারই আর্তকণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি......আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারছি না, শীঘ্র গাড়ি বের করতে বলে দিন।

সহকারী ছুটলেন ড্রাইভারের কাছে।

ড্রাইভার তখন গাড়ি বের করে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলো, স্বনামধন্য ব্যক্তির সহকারী এসে জানাতেই ড্রাইভার জানালো সে তৈরি আছে।

স্বনামধন্য ব্যক্তি দ্রুত গাড়িতে চেপে বসলেন।

ড্রাইভার ড্রাইভিং আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো। গাড়ি ছুটলো সেই গোপন বাড়িখানার দিকে।

ড্রাইভার খুব দ্রুত গাড়ি চালনা করে চললো, বেশি বিলম্ব হলো না তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে।

গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি, কারণ সেখানে কোনো লোককে তিনি দেখতে পেলেন না। এবার তিনি গোপন পথ দিয়ে ভিতর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

সম্মুখে বিরাট একখানা কক্ষ। সেই কক্ষের মেঝের মাঝামাঝি একটা সেক্রেটারীয়েট টেবিল, টেবিলের পাশে কয়েকখানা চেয়ার। একপাশে ফোনের রিসিভার। কিন্তু টেবিলে নজর পড়তেই দেখতে পেলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি, ছোটবাবু টেবিলে উবু হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ হাতখানা রিসিভার সহ ঠিক মুখের কাছে পড়ে আছে। আরও অবাক হলেন স্বনামধন্য

ব্যক্তি, তিনি যা ভেবেছিলেন তাই, ছোটবাবুর পিঠে একখানা ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে।

স্বনামধন্য ব্যক্তি শিউরে উঠলেন, তিনি ভীত দৃষ্টি মেলে এগুলেন ছোটবাবুর পাশে। দেখলেন ছোরাখানায় একটি কাগজও গাঁথা আছে।

স্বনামধন্য ব্যক্তি রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে পুনরায় পুলিশ অফিসে ফোন করতে যাবেন, ঐ মুহূর্তে পিছনে জমকালো বেশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। বাম হাতে স্বনামধন্য ব্যক্তির রিসিভার সহ ডান হাতখানা চেপে ধরলো সে।

চমকে ফিরে তাকালেন স্বনামধন্য ব্যক্তি, জমকালো পোশাকপরা একটা বলিষ্ঠ পুরুষকে দেখতে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হলেন, তিনি অনুমানে ধরে নিলেন এই সেই ব্যক্তি যে ছোটবাবুর কাছে টেলিফোন করেছিলো কয়েকদিন পূর্বে এবং আজ ছোটবাবুকে ছোরা বিদ্ধও করেছে এই ব্যক্তি, তাতে কোনো ভুল নেই। অন্তরাত্মা আত্মা যদিও শিউরে উঠলো তাঁর তবু গলায় জোর দিয়ে বললেন—কে তুমি? কোন্ সাহসে এই জায়গায় এসেছো? নিশ্চয়ই ছোট বাবুকে তুমিই......

হাঁ, আমিই তাকে ছোরাবিদ্ধ করেছি শুধু তাই নয়, তার পাঠানো সমস্ত মালামাল আমিই সিংহা দ্বীপের দুঃস্থ অধিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি......

আর্তনাদ করে উঠেন স্বনামধন্য ব্যক্তি—কি বললে, কি বললে তুমি? ছোটবাবু যে মালামাল জাহাজে করে গতকাল সীমান্তের ওপারে চালান দিয়েছিলেন সে মাল তুমি......

হাঁ, সে মাল আমি সিংহা দ্বীপবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। ছোটবাবু একটু পূর্বে সেই সংবাদই আপনাকে জানানোর জন্য রিসিভার হাতে তুলে নিয়েছিলো কিন্তু সে সুযোগ আমি আর তাকে দেইনি।

কে তুমি? তুমি ছোটবাবুকে হত্যা করেছো—জানো এই মুহূর্তে তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। পারি নয়, এই দন্ডে তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো।

কিন্তু সে সুযোগ আর তোমাকে দেবো না নরপশু। হিরন্ময়ের নিকটে তোমাদের নামের লিষ্ট আমি পেয়েছি, কাজেই তোমাদের উপযুক্ত সাজা দিতে আমাকে বেশি বেগ পেতে হবে না। যদি এই মুহূর্তে মরতে না চাও তবে চলে এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়? কোথায় তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?

যেখানে আছে হিরন্ময়।

হিরন্ময় বাবু তাহলে......

হাঁ, সে জীবিত আছে।
কোথায় আছেন তিনি?
তুমি যেখানে যাচ্ছো এই মুহূর্তে সেখানে।
আমি, আমি যাচ্ছি......
হাঁ তুমি যাচ্ছো।
কিন্তু...
কোনো কিন্তু নয়, চলো।
ছোট, ছোটবাবু...
পুলিশ এসে তার ব্যবস্থা করবে।
না, আমি যাবো না।

বনহুর তার বেল্টের খাপ থেকে খুলে নিলো সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা চেপে ধরলো স্বনামধন্য ব্যক্তির বুকে, বললো—চলো।

এবার টু শব্দ করতে পারলেন না স্বনামধন্য ব্যক্তি, তিনি কলের পুতুলের মত বনহুরকে অনুসরণ করলেন।

বাইরেই গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরলো—উঠো।

গাড়িখানা স্বনামধন্য ব্যক্তিরই নিজের গাড়ি। আজ সেই গাড়িতে উঠতে গিয়ে দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো তবু তিনি উঠতে বাধ্য হলেন, কারণ পিঠে ঠেকে আছে জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির ছোরা আগাখানা।

নীরবে গাড়িতে ওঠে বসলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁকে পাশে বসিয়ে এবার বনহুর স্বয়ং উঠে বসলো তাঁর পাশে ড্রাইভিং আসনে। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

মাঝপথে গাড়িখানা পৌঁছলো। তখন নীরব নিঝুম চারদিক। স্বনামধন্য ব্যক্তির চোখ দুটো গাড়ি থামিয়ে বেঁধে দিলো বনহুর।

এতক্ষণ ফাংহার রাজপথ বেয়ে ফাংহার এক স্বনামধন্য ব্যক্তিকে কৌশলে বন্দী করে নিয়ে চললো বনহুর কিন্তু তিনি টু শব্দ করতে পারলেন না, কারণ বনহুর তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে নেবার পূর্বে ছোরাখানা দেখিয়ে বলে দিয়েছিলো, খবরদার, একটু নড়চড় করতে পারবে না। যদি কোনোরকম শব্দ উচ্চারণ করো বা নড়চড় করেন তাহলে আমার এই সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা তোমার নাদুশনুদুশ কোমর পাজর ভেদ করে রক্ত শুষে নেবে। তোমার প্রাণহীন দেহখানা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে গাড়ির অভ্যন্তরে, কাজেই নিশ্চুপ থাকবে।

স্বনামধন্য ব্যক্তি একটু পূর্বে তাঁরই অংশীদার ছোটবাবুর অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছেন, কি নির্মম অপমৃত্যু! তাই তিনি কোনোরকম শব্দ করতেও সাহসী হলেন না।

গাড়িখানা এক সময় জনহীন পথ বেয়ে একটা নির্জন পোড়োবাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো বনহুর। গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললো সে—নামো!

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন স্বনামধন্য মহাত্মন। একদিন যাঁর অংগুলি হেলনে শত শত সরকারি কর্মচারী শশব্যস্ত হয়ে উঠতো, সেই মহান অধিপতির আজ বিড়ালতপস্বী অবস্থা।

কুঁকড়ে নেমে চললেন তিনি গাড়ি থেকে।

বনহুর সম্মুখে এগিয়ে চলেছে, তার হাতের মুঠায় রয়েছে মন্ত্রযষ্ঠি।

স্বনামধন্য ব্যক্তি মন্ত্র ষষ্ঠির আকর্ষণে যেন এগুচ্ছে। এ পথ সে পথ করে নেমে চললেন নিচে, একটা সুড়ঙ্গপথ বেয়ে। একেবারে নিচে এসে পৌঁছলো বনহুর।

তার পিছনে স্বনামধন্য ব্যক্তি।

তিনি নিচে নেমে আসতেই চমকে উঠলেন—দেখলেন হিরন্ময় মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, হাত-পায়ে লৌহশিকল বাঁধা। গলায় কমপক্ষে দশ সের ওজনের একটা পাথর শিকলের সঙ্গে আটকানো আছে। পাথরের ভারে পিঠখানা তার কুঁকড়ে এসেছে কুঁজোর মত।

হিরন্ময় তার অংশীদার মহাত্মনকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে উনি এসেছেন। যার একটা কথায় যা-না তা ঘটে যেতে পারে। খুনীর খুনের অপরাধ মাফ হয়ে যায় যার একটা ফোনে। হিরন্ময় মনে করলো এবার সে মুক্তি পাবে। নিশ্চয়ই মহাত্মন জানতে পেরেছিলেন তার এ অবস্থার কথা। নাহলে তিনি কি করে এলেন এখানে?

হিরন্ময় বলে উঠলো—স্যার, কে আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছে? কেমন করে আপনি জানতে পারলেন আমি বন্দী? আপনাকে কোন স্বহৃদয় ব্যক্তি এখানে নিয়ে এলেন?

স্বনামধন্য ব্যক্তি হিরন্ময়ের প্রশ্নে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখখানা তাঁর কালো হয়ে উঠেছে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধী ব্যক্তি যেমন লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে যায়, তেমনি স্বনামধন্য ব্যক্তির মুখোভাব হয়ে উঠেছে অন্ধকারময়।

বনহুর কোনো কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার বললো সে—তোমার এ অবস্থার কথা উনার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে আপনাআপনি, কারণ তোমার সঙ্গে উনার অন্তরের সম্বন্ধ কিনা! করতালি দিলো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক সেই স্থানে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—হিরন্ময়কে যেমনভাবে সমাদর করেছো তোমরা, তেমনিভাবে এই স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সমাদর দেখাবে। হিরন্ময়ের গলার চেইনে কত সের লকেট ঝুলিয়ে দিয়েছো?

একজন অনুচর বললো—মালিক, উনার গলার চেইনে দশ সের ওজনের লকেট ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বললো বনহুর—তাহলে ইনার গলার চেইনে বিশ সের ওজন দেবে...কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো বনহুর তখনকার মত।

অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকালেন স্বনামধন্য ব্যক্তি অনুচরদ্বয়ের মুখের দিকে।

হিরন্ময় বুঝতে পারলো কর্তা মহাশয়ের আগমন নিজ ইচ্ছায় হয়নি, তাঁকেও তারই মত বাধ্য করে নিয়ে এসেছে ওরা এখানে।

স্বনামধন্য ব্যক্তির অবস্থাও তারই মত বুঝতে পেরে হিরন্ময় নিরাশ কণ্ঠে বললো—আপনিও তাহলে আমারই মত বন্দী এদের হাতে?

স্বনামধন্য ব্যক্তি বললেন—এখন দেখছি তাই। বড়বাবু, আমাদের সব গেছে, সব গেছে...কেঁদে ফেললেন তিনি।

হিরন্ময় অসহায় কণ্ঠে বললো—আজ বুঝতে পারছি সবের তুলনায় নিজের জীবন কত মূল্যবান। স্যার, সব চলে যাক তবু যদি মুক্তি পেতাম! আপনি বুঝতে পারবেন না আমার কত কষ্ট হচ্ছে...এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। অসহ্য যন্ত্রণা স্যার, অসহ্য যন্ত্রণা...আর সহ্য করতে পারছি না।

ততক্ষণে বনহুরের দু'জন অনুচর স্বনামধন্য ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়ালো।

একটা লোক ঠেলাগাড়িতে বহন করে আনলো একটা ভারী লৌহশিকল। শিকলখানা পৌঁছানো মাত্র স্বনামধন্য ব্যক্তির চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠলো—আজ তিনি নিরুপায়, এতদিন কত মানুষের জীবন নিয়ে তিনি জুয়া খেলেছেন, আজ তাঁর নিজের পরিণতি লক্ষ্য করে শিউরে উঠলেন।

শিকলখানা দিয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তির দেহ মজবুত করে বাঁধা হলো, যেমন করে বাঁধা হয়েছে হিরন্ময়ের দেহখানা।

এমন সময় একখানা বিরাট পাথর বহন করে নিয়ে এলো দু'জন অনুচর। পাথরখানা বিশ সের হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পাথরখানা তারা স্বনামধন্য ব্যক্তির গলায় ঝুলিয়ে দিলো শিকলের সঙ্গে আটকিয়ে।

স্বনামধন্য ব্যক্তির অবস্থা দেখে কাকের চোখেও পানি আসবে। কিন্তু এখানে তাঁর এ অবস্থা দেখে কারও মনে দয়ার উদ্রেক হলো না।

হিরন্ময় নিজের অবস্থার জন্যই কাহিল ছিলো, সে কি করবে, কাঁদছে বেচারাম বেচারীর মত।

এই মুহূর্তে হিরন্ময় স্বনামধন্য ব্যক্তির অবস্থা দেখে কোনো উক্তি উচ্চারণ করতে পারছে না। স্বনামধন্য ব্যক্তি একেবারে কুঁকড়ে গেলেন, এমন অবস্থা তার কোনদিন হতে পারে, ভাবতেও পারেননি।

বনহুরের নির্দেশমত কাজ হলো।

আজ হিরন্ময় আর স্বনামধন্য ব্যক্তির অবস্থা এমন কাহিল হলো যা বর্ণনাতীত। ঘেমে নেয়ে উঠছেন স্বনামধন্য ব্যক্তি। জীবনে যিনি দুঃখকষ্ট কাকে বলে বোঝেন না, বোঝেন না ক্ষুধার জ্বালা কেমন, অভাবের তাড়না কেমন তাও জানেন না—আজ সেই কোমলদেহী সুখী মানুষটার সমস্ত দেহে শিকল বাঁধা, গলায় হাতে পায়ে এমন কি কোমরেও শিকল জড়ানো হয়েছে। গলায় বিশ সের ওজনের পাথর ঝুলছে।

এমনভাবে হিরন্ময় ও ফাংহার স্বনামধন্য ব্যক্তির শরীর থামের সঙ্গে এঁটে বাধা হয়েছিলো, তারা কিছুতেই বসতে পারবে না, বিশ্রামের তো কোনো বালাই নেই।

হায়রে অদৃষ্ট! কে জানতো তাদের এই পরিণাম হবে। একদিন যাদের দাপটে ফাংহাবাসীর হৃদয়কম্প হতো তারাই আজ মেষশাবকের চেয়েও অসহায় হয়ে পড়েছে।

বনহুর প্রবেশ করে সেখানে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে সে স্বনামধন্য ব্যক্তিদ্বয়ের অবস্থা। তারাও করুণ অসহায় চোখে তাকায় বনহুরের দিকে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—মহামান্য অতিথিদ্বয়, আপনারা আমার উপর রাগান্বিত হবেন না, কারণ আপনাদের কর্মফল আপনারা ভোগ করছেন। বনহুর অনুচরগণকে লক্ষ্য করে বললো এবার—আমি যতদিন ফিরে না আসি, ততদিন অতিথিদ্বয়কে সসম্মানে এই অবস্থায় দন্ডায়মান রাখো।

বনহুর বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

বাইরে শোনা গেলো অশ্বপদশব্দ।

❑

রহমান, কি সংবাদ বলো?

সর্দার, ফাংহার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে, এবার চলুন কান্দাই ফিরে যাই?

হাঁ, আমিও সেই কথা ভাবছি। আমাদের কান্দাই রওনা দেবার পূর্বে আরও কিছু কাজ আছে। নীলসাগর তলের ধনাগার যা একদিন হিরন্ময়ের ছিলো তা এখন আমার আয়ত্তে এসেছে। বহু ধনরত্ন এবং সোনা সেখানে মজুত আছে। এই ধনাগার আমি নষ্ট করতে চাই না। নীলসাগর তলে এই ধনাগার বা স্বর্ণগুহা আমার ফাংহা আস্তানা হবে। এখানে থাকবে আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। আর মাঝে মাঝে তুমি ফাংহায় এসে এই আস্তানা পরিচালনা করবে।

সর্দার, মিস রীনা......

হাঁ, মিস রীনা সম্বন্ধে চিন্তাই বটে। সে এখন কোথায় আছে?

ফাংহা নতুন ঘাটিতে।

কান্দাই ফিরে যাবার পূর্বে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি সে কান্দাই আমাদের সঙ্গে যেতে যায়?

তা হয় না রহমান, দীপালী আমার কান্দাই শহরের আস্তানায় আছে, আজও আমি তার কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি।

এ দোষ তো আপনার নয় সর্দার। আপনি দীপালীকে তার ইচ্ছামত অধিকার দিয়েছেন, সে যা খুশি তাই করতে পারে—থাকতেও পারে, যেতেও পারে।

হাঁ রহমান, দিপালীকে আমি বারবার বলেছি তোমার ইচ্ছামত তুমি যেতে পারো, কিন্তু দিপালী আজও যায়নি। অর্থ-ধন-সম্পদ যা চায় সে, তাই তাকে দিতে রাজিও আছি...

সর্দার, অর্থ-ধন-সম্পদ এসব কিছুরই মোহ তার নেই।

তবে কি চায় সে?

রহমান নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো জবাব সে দিলো না সর্দারের কথায়। একটু নিশ্চুপ থেকে বললো রহমান—সর্দার মোহসিন ওকে ভালবাসে......

বেশ তো, দিপালীও নিশ্চয়ই তাকে......

না সর্দার, দিপালী মোহসিনকে মোটেই সহ্য করতে পারে না, দিপালী তাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

তাহলে মোহসিন অন্যায় করছে তাকে ভালবেসে। দিপালী যদি তাকে সহ্য করতে না পারে তাহলে মোহসিনকে সংযত হওয়াই শ্রেয়। তবে একটা কথা, এবার দিপালীর কাছে জেনে নিও, সে কি করতে চায়।

সর্দার, দিপালী আমাদের অনেক কাজে সাহায্য করে থাকে—তাকে বিশেষ প্রয়োজন।

হাঁ, আমি সব জানি, কয়েকবার সে নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমাদের কাজে সহায়তা করেছে। ওকে আমাদের প্রয়োজন বটে কিন্তু কতদিন এমনি করে সে আমাদের উপকার করে চলবে।

দিপালীর বাসনা সে যতদিন বাঁচবে আমাদের কাছ থেকে দূরে যাবে না। আপনি তাকে কয়েকবার নরপশুদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, তাই সে চিরকাল আপনার কাছে ঋণী।

বনহুর বললো---যাক সে কথা, এখন শোন। আমি কান্দাই ফিরে যাবার পূর্বে একবার নীলসাগর তলে হিরন্ময়ের সেই গুপ্ত স্বর্ণগুহায় যাবো।

সর্দার, একা যাওয়া কি ঠিক হবে? শুনেছি নীলসাগর তলে যাবার সময় ফাংহা সাগর আর নীল সাগর যেখানে সংযোগ হয়েছে সেই স্থানে অতল গহ্বরে অদ্ভুত এক জীব আছে।

অদ্ভুত জীব!

হাঁ সর্দার, সে জীব পুরুষ নয়—নারী, তার অর্ধেক দেহ মাছের মত, অর্ধেক দেহ নারীমূর্তি।

সেকি!

হাঁ সর্দার, ঐ পথে জাহাজ যাবার সময় হঠাৎ কোনো কোনো জাহাজের যাত্রীরা ঐ অদ্ভুত জীব লক্ষ্য করেছে। আমার মনে হয় এই জীবগুলোও হিরন্ময়ের অনুচর।

বনহুর হেসে বললো---রহমান, তুমি ভুল করছো, কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় সাগরতলে বা সাগরের জলে নানা ধরনের উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু আছে। তার প্রমাণও পেয়েছি আমরা সেই কিউকিলা জন্তু আবিষ্কারে। জানি না সাগরতলে আরও কি আছে!

সর্দার, আমার ভয় হয় ঐ অদ্ভুত জীবগুলো যদি আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করে বসে, যখন আপনি সাগরতলে যাবেন?

রহমান, মিছেমিছি তুমি ভাবো। নীলসাগর তলে এই আমার প্রথম যাত্রা নয়। হিরন্ময়কে অনুসরণ করে আমি দু'বার গেছি নীলসাগর তলে তার সেই স্বর্ণগুহায়। তবে মৃত্যু যখন আসবে তখন কেউ রোধ করতে পারবে না। রহমান, শয়তান হিরন্ময়ও ফাংহার মহান অধিপতির যাতে মৃত্যু না হয়, সেইদিকে খেয়াল রাখবে। তুমি গিয়ে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে আসবে, বুঝলে?

বুঝেছি সর্দার।

আর মিস রীনাকে বলবে সে কোথায় যেতে চায়, তাকে এমনভাবে পাঠাবে যেন তার কোনো অভাব-অভিযোগ না থাকে।

আচ্ছা সর্দার, আপনার নির্দেশমত কাজ করবো।

তুমি আজই ফাংহার নতুন ঘাটিতে যাও এবং রীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানো সে কি করতে চায়।

এখানে যখন বনহুর আর রহমানের আলাপ আলোচনা হচ্ছিলো তখন বনহুরের নতুন ঘাটিতে মিস রীনা বসে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছিলো। তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। নরশয়তান হিরন্ময় তার সবকিছু বিনষ্ট করে দিয়েছে। ওর কথা সে যত ভাবে ততই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। ওরই পরামর্শে সে কিনা করেছে। কত নরহত্যা সে করেছে হিরন্ময়কে খুশি করার জন্য। মিস রীনা যে কক্ষে বসে বসে ভাবছিলো, সেই কক্ষের পাশেই ছিলো ঐ কক্ষ, যে কক্ষে লৌহশিকলে আবদ্ধ দুটি ব্যক্তি যারা ঘোলা জলের পাকাল মাছ।

মিস রীনা উঠে দাঁড়ালো, তাকালো সে কক্ষের চারিদিকে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো অদূরে একটা ছোরা টেবিলে পড়ে আছে। সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা তুলে নিলো মিস রীনা হাতের মুঠায়।

বাইরে তাকিয়ে দেখলো কেউ কোথাও নেই।

পাশের কক্ষে মহামান্য ব্যক্তিদ্বয়ের গোঙ্গানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মহামান্য ব্যক্তিদ্বয়ের সুখের শরীর আজ নেই, শরীরে এই লৌহশিকল সহ্য হয় কি? তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে গোঙ্গানির আওয়াজ।

মিস রীনা ছোরা হাতে সেই কক্ষে প্রবেশ করলো, যে কক্ষ মধ্যে লৌহশিকলে আবদ্ধ ছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তিদ্বয়।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে অধর দংশন করলো মিস রীনা। এগিয়ে গেলো সে হিরন্ময় ও ফাংহার মহান ব্যক্তিটির দিকে। মিস রীনাকে দেখে হিরন্ময়ের মনে একটু আশার উদয় হলো, সে মনে করলো এবার মিস রীনা তাকে মুক্ত করে নেবে কিন্তু তার সেই গুড়ে সে বালি।

অবশ্য হিরন্ময় এত কষ্টের মধ্যেও হাসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু হাসিটা তার বিকৃত মনে হলো। চোখ দুটো বসে গেছে, চুলগুলো জটা ধরেছে, ফুলে গেছে গলাটা, মোটা শিকল কেটে বসে গেছে যেন ঘাড়ের মধ্যে। মিস রীনাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললো—রীনা, রীনা তুমি এসেছো। বাঁচাও, বাঁচাও রীনা...—

রীনা এগিয়ে আসছে, তার দু'চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, ডান হাতে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

রীনা আরও সরে একেবারে হিরন্ময়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, দাঁতে দাঁত পিষে বলে—বাঁচাবো! হাঁ বাঁচাবো তোমাকে! নরশয়তান, তুমি আমাকে ফুসলিয়ে নানা কু'কর্ম করিয়ে নিয়েছিলে। নরহত্যা করিয়েছো আমার দ্বারা, আজ তাই আমি এসেছি তোমাকে হত্যা করতে।

সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা উদ্যত করে ধরে মিস রীনা।

শিউরে উঠে শয়তান হিরন্ময়, করুণ কণ্ঠে বলে—মিস রীনা, তুমি যা চাও তাই দেবো তোমাকে। বলো তুমি কি চাও?

রীনা হেসে উঠলো খিল খিল করে, তারপর বললো—তুমি দেবে আমাকে? যা চাবো তাই দেবে! যেমন তুমি আমাকে নীলসাগর তলে নীলকমল বানিয়ে রাখতে চেয়েছিলে, তাই না?

মিস রীনা আমাকে ক্ষমা করো।

ক্ষমা! ক্ষমা করবো তোমাকে? শয়তান, সেদিন যদি ঐ দেবপুরুষটা ঠিক সময় গিয়ে হাজির না হতো তাহলে আজ আমি কোথায় থাকতাম? তোমার সেই গুপ্ত স্বর্ণাগারে যক্ষী হয়ে থাকতাম আমি। হাঃ হাঃ হাঃ আর নয় শয়তান, তোমার আর মুক্তি নেই।

রীনা!

চুপ করো শয়তান আমার নাম তুমি ঐ মুখে উচ্চারণ করোনা। তোমাকে আমি হত্যা করবো না। হত্যা করে তোমাকে মুক্তি দেবো না। তোমার উপযুক্ত শাস্তিই তুমি পাচ্ছো। তবে আমি তোমাকে আরও একটা শাস্তি দেবো—সে হচ্ছে তোমার জিভ আমি কেটে নেবো। যে জিভ দিয়ে তুমি শত শত মিথ্যা কথা বলেছো, মিথ্যার ফুলঝুরি খেলেছো।

রীনার কথায় ভীষণ ভয় পেয়ে যায় নরপশু হিরন্ময়! বিদেশ থেকে এসেছে সে এদেশে সোনা সংগ্রহ করতে—শুধু সোনা নয়, তার সঙ্গে আরও যা মূল্যবান সামগ্রী যা পাওয়া যায় তাও সে সংগ্রহ করে চলেছিলো। নরপশু কৌশলে হাত করে নিয়েছিলো এদেশের গণ্যমান্য স্বনামধন্য ব্যক্তিদের অনেককেই।

আজ যিনি তার পাশে জিঞ্জিরাবদ্ধ তিনিও একজন মহান ব্যক্তি তবে দেশের যে একজন পরম শত্রু তিনি তাতে কোনো ভুল নেই।

মানুষের হাড়ে যেমন ঘুণ ধরে, মানুষকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তেমনি দেশের চরম শত্রু এরা—দেশের ঘুণ স্বরূপ। এরাও দেশকে দিনে দিনে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর তাই চায় দেশকে ঘুণ মুক্ত করতে। দেশের বুক থেকে সর্বনেশে সাধু-সন্ন্যাসীদের নির্মূল করতে। হাঁ, সে বহু করেছে কিন্তু এদের হত্যা করে নির্মূল করা যাবে না। একজনকে হত্যা করলে এদের প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে সৃষ্টি হয় শত শত নরশয়তান। তাই বনহুর এদের হত্যা না করে জীবন্মৃত করে রাখতে চায়। ওরা যেন বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে নিজেদের কর্মফলের কথা।

রীনা এবার মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছোরাখানা বসিয়ে দিতে যায় হিরন্ময়ের বুকে।

পিছন থেকে খপ্ করে কে যেন ধরে ফেলে রীনার হাতখানা।

রীনা ফিরে তাকায়।

চমকে উঠে রীনা! এ যে সেই দেবপুরুষ যিনি তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করেছেন।

রীনার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে উঠে—ওকে হত্যা করে মুক্তি দিতে যাচ্ছো মিস রীনা? যে পাপ ও করেছে তার মুক্তি নেই। ওর শাস্তি তিল তিল করে ওকে মৃত্যুযন্ত্রণা দেওয়া।

হিরন্ময় বলে—না না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পাথরখানা আমার ঘাড়ে কেটে বসে গেছে। উঃ কি চরম শাস্তি, আমি যে পাপ করেছি তার চরম শাস্তি আমি পেয়েছি। এবার আমাকে মুক্তি দিন......

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

স্বনামধন্য ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর—আর আপনি?

পারছি না, আমি সহ্য করতে পারছি না। হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন স্বনামধন্য ব্যক্তি।

বনহুর বলে—এই তো সবে শুরু, যতদিন না আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হয়, ততদিন আপনাকে এ অবস্থায় কাটাতে হবে।

তারপর? তারপর?......

তারপর মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি!

উঃ! কি যন্ত্রণা, ভীষণ কষ্ট। আর যে পারছি না, আর যে পারছি না।

কেন, এ কথা পূর্বে মনে করেননি কেন? যখন জনগণের সম্পদ নিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলেছিলেন, তখন ভুলে ছিলেন, যে এর পরিণতি একদিন আসবে। তারপর ফিরে তাকায় বনহুর রীনার দিকে—মিস রীনা, এরা এখানেই থাকবে, চলো বেরিয়ে যাই।

বনহুর রীনাসহ বেরিয়ে গেলো।

হিরন্ময় ও স্বনামধন্য ব্যক্তি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, কিন্তু সে কান্নার শব্দ দেয়ালের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেলো।

ফাংহা গুপ্তঘাটি থেকে বেরিয়ে এলো বনহুর আর মিস রীনা। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, অবশ্য এ গাড়িতেই একটু পূর্বে বনহুর পৌঁছেছিলো এখানে।

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো বনহুর—উঠো।

রীনা গাড়িতে উঠে বসলো।

বনহুর উঠে বসলো ড্রাইভিং আসনে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

রীনা চুপচাপ বসে আছে, মুখে তার কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে সে বনহুরের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখে নিচ্ছিলো। সত্যি এ যেন এক দেবপুরুষ! মনে মনে ভাবছে রীনা, বহু লোক সে দেখেছে, বহুলোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে কিন্তু এমন লোক সে কোনোদিন দেখেনি, এমন অদ্ভুত ব্যবহারও সে পায়নি কারও কাছে। যার পাশেই সে গেছে সেই চেয়েছে তাকে ভোগ করতে, একটা তীব্র লালসা নিয়ে কথা বলেছে, কিন্তু কে এই মহান দেবতা যার মধ্যে সে দেখতে পায়নি এ সবের লেশমাত্র। রীনা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো আর ভাবছিলো কথাগুলো।

বনহুর ডাকলো—মিস রীনা!

বলুন?

হিরন্ময়কে তুমি কতদিন ধরে চিনতে?

প্রায় চার বছর।

এর আগে তুমি কি করতে?

চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি। সংক্ষেপে রীনা বললো তার জীবনের সব কথা।

বনহুর ড্রাইভ করতে করতে শুনছিলো রীনার জীবন ইতিহাস।

রীনা বলা শেষ করলো।

বনহুর বললো—তুমি এখন কি করতে চাও মিস রীনা?

আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করবো!

তোমার আত্মীয় কেউ......

কেউ নেই, তবে যাঁরা আছেন তাঁরা আমাকে আশ্রয় দেবেন না।

কেন?

আমি তাদের মতামত না নিয়েই হিরন্ময়ের কাছে চাকরি নিয়েছিলাম। হিরন্ময় অসৎ একথা তারা জানতেন, কাজেই আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাদের পাশে ফিরে যাবো, বলুন?

তুমি যদি প্রচুর ধন-সম্পদ পাও, তুমি যদি তোমার থাকবার মত বাসস্থান পাও তাহলে তো তোমার কোনো আত্মীয়ের প্রয়োজন হবে না?

মিস রীনা কোনো কথা বললো না।

বনহুর বলে চলেছে—আমি তোমার জন্য এমন একটা ব্যবস্থা করবো যাতে তোমার কোনো আত্মীয়ের দরকার না হয়।

বেশ, তাই হবে।

নীলসাগর তলে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। হিরন্ময়ের স্বর্ণগুহা থেকে তুমি তোমার প্রয়োজনমত অর্থ ও স্বর্ণ নিয়ে আসবে।

রীনা চুপ রইলো।

বনহুর বললো—তুমি ভয় পাচ্ছো, আমার সঙ্গে একা যেতে চাও না, এই তো?

রীনা বললো—আপনি দেবপুরুষ। আমি আপনার সঙ্গে সব জায়গায় যেতে পারবো। আপনি আমায় নিয়ে চলুন। একটু চুপ থেকে বললো রীনা—একটা কথা বলবো, সঠিক জবাব দেবেন তো?

দেবো, বলো কি বলতে চাও?

আপনাকে যত দেখছি ততই আমি মুগ্ধ হচ্ছি, হচ্ছি বিস্মিত। জানি না আপনি কে, কিই বা আপনার পরিচয়? তবে আপনি সাধারণ ব্যক্তি নন এটা আমি বুঝতে পেরেছি। বলুন আপনি কে?

বনহুর চট করে জবাব দিতে পারলো না, একটু ভেবে বললো—আমি যেই হই না কেন, তোমার বন্ধু ও হিতৈষী এটাই আমার পরিচয়।

না, আমি তা শুনতে চাই না। আপনার আসল পরিচয় আমার দরকার।

কিন্তু......

কোনও কিন্তু নয়, আপনাকে বলতেই হবে।

এত যখন জানার ইচ্ছা তোমার তখন নীলসাগর তল থেকে ফিরে এসে জানাবো।

নীলসাগর তলে গেলে আর ফিরে নাও আসতে পারি।

হাঁ, সে কথা সত্য। নীলসাগর তলে যাওয়া অত্যন্ত বিপদজনক। তবে যদি বিপদ আসে দু'জনেরই ভাগ্যে আসবে। মরবো দু'জনেই তাহলে পরিচয় জেনে কি লাভ হবে মিস রীনা!

না আমি কোনো কথা শুনবো না—বলুন, কে আপনি?

দস্যু বনহুরের নাম শুনেছো?

দস্যু বনহুর!

হাঁ।

শুনেছি, শুনেছি এত বড় দস্যু নাকি পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয়জন আর নেই। যেমন সে শক্তিশালী তেমনি সে নাকি দুর্দান্ত, তা ছাড়া সে নাকি......

বলো থামলে কেন?

যাদুবিদ্যায় অদ্বিতীয়......

কি বললে?

যাদুবিদ্যায় অদ্বিতীয় সে। যে কোনো নারীকে সে যাদুবিদ্যায় হাত করে

ও, তাহলে তুমি দেখছি সবই শুনেছো দস্যু বনহুর সম্বন্ধে?

হাঁ, আমি তার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। আচ্ছা, আপনি কি তাকে চেনেন? তাকে দেখেছেন কোনোদিন?

বনহুর নিজের পরিচয় দেবে বলেই কথাটা তুলেছিলো, কিন্তু এখন সে চট করে পরিচয় দিতে পারলো না। রীনা যে প্রশ্ন করে বসলো তা একটু অগোছালো, তাই বললো বনহুর—হাঁ, চিনি এবং দেখেছি বহুবার।

সত্যি বলছেন?

হাঁ সত্যি, আর সত্যি বলেই তো তোমাকে বললাম।

আমি যানতে চাইলাম আপনার পরিচয়, আর আপনি তুললেন কিনা দস্যু বনহুরের কথা।

তুমি জানতে চাইলে বলেই তো আমি তুললাম, কারণ দস্যু বনহুরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে......

কি বললেন, আপনার সঙ্গে দস্যু বনহুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে?

হাঁ, আমি তার একজন অনুচর।

আপনি, আপনি দস্যু বনহুরের অনুচর?

বিশ্বাস যদি করো তাহলে সত্যি।

কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় না আপনি একজন দস্যুর অনুচর, আপনি মহৎপ্রাণ ব্যক্তি......

দস্যু বনহুরের অনুচর হলে কি সে মহৎ হতে পারে না?

শুনেছি দস্যু বনহুরের দয়ামায়া বলতে কিছু নেই, তাই......

তাই তার অনুচররাও বুঝি দয়ামায়াহীন হবে?

আমি তাই মনে করি।

কিন্তু তোমার মনে করাটা সত্যি নাও হতে পারে। মিস রীনা, দস্যু হলেই যে তারা হৃদয়হীন হবে এ কথা কি করে তুমি মনে করলে? যদি বলি সাধুতার মুখোস পরে যারা পরের সর্বনাশ করে, তারা দস্যুদের চেয়েও হৃদয়হীন?

হাঁ, সে কথা সত্য।

যেমন হিরন্ময় এবং এমনি সাধু শয়তান অনেক আছে।

ঠিক বলেছেন আপনি, এরা দস্যুদের চেয়েও মন্দলোক।

হাঁ মিস রীনা, এরা ঘোলা জলে পাকাল মাছ।

এক সময় গাড়ি এসে পৌঁছলো এক নির্জন জায়গায়।

বনহুর বললো—নেমে আসো মিস রীনা।

রীনা নামলো।

বনহুর বললো—আসো এবার আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবো?

নীলসাগর তলে।

নীলার মুখ কালো হলো।

বনহুর রীনার মুখোভাব লক্ষ্য করে বললো—ভয় নেই মিস রীনা, আমি তোমাকে নীল সাগরের তলে নীলকমল বানিয়ে রাখবো না।

একটা পাথর তৈরি গীর্জার পাশে এসে থামলো বনহুর। এতক্ষণ রীনা তাকে অনুসরণ করে আসছিলো। বনহুর চলতে চলতে কথা বলছিলো তার সঙ্গে।

এবার বনহুর বললো—এই গীর্জার মধ্যে আছে একটা সুড়ঙ্গ পথ, এ পথ নীলসাগর তলে গিয়ে পৌঁছেছে।

এ পথের সন্ধান আপনি কি করে পেলেন?

ম্যাপ! এই পথের সন্ধান আমি পেয়েছি ম্যাপের মধ্যে। মিস রীনা, এ পথ তোমার জানা থাকবে, তুমিই শুধু এ পথে নীলসাগর তলে যেতে পারবে এবং তোমার ইচ্ছামত তুমি যা প্রয়োজন নিয়ে আসবে। মিস রীনা, আমি তাই তোমাকে এ পথের সন্ধান জানিয়ে দিলাম।

সত্যি আপনি মহৎ পুরুষ। হিরন্ময়ের কাছে আমার কতদিন কেটেছে। আমি তাকে তার কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, তবু সে কোনোদিন আমাকে বিশ্বাস করেনি......

বনহুর মিস রীনাসহ সেই পাথর দিয়ে তৈরি পুরানো গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করলো।

কয়েকটা বাদুর এদিক থেকে ওদিকে উড়ে গেলো।

গীর্জার মধ্যে বেশ অন্ধকার।

বনহুর চাপ দিলো একটা জায়গায়, অমনি সরে গেলো সম্মুখের একটা দেয়াল।

রীনা অবাক হয়ে দেখলো, দেয়াল সরে যেতেই একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এলো।

বনহুর বললো—আসো আমার সঙ্গে।

যদিও রীনার বেশ ভয় হচ্ছিলো, তবু সে চুপ থাকতে পারলো না, ধীর পদক্ষেপে বনহুরকে অনুসরণ করলো। বনহুর পকেট থেকে ক্ষুদে টর্চলাইটটা বের করে সম্মুখে এগিয়ে চললো।

ভাঙ্গা এবং পোড়ো একটা গীর্জার মধ্যে এত সুন্দর সুড়ঙ্গপথ আছে কেউ ভাবতেও পারবে না, যেমন রীনার মনে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। হিরন্ময় তাকে দিয়ে কত অসাধ্য কাজ সমাধা করে নিয়েছে অথচ এ পথ তাকে কোনোদিন দেখায়নি। দেখানো তো দূরের কথা, বলেনি পর্যন্ত।

মিস রীনা, থমকে দাঁড়িয়ে ডাকলো বনহুর।
রীনা জবাব দিলো—বলুন!
ভয় পাচ্ছো না তো?
না।
তবে আসো আমার সঙ্গে।
কতদূর যেতে হবে?
অনেকটা পথ।
কিন্তু......
কষ্ট হচ্ছে, এই তো?
কষ্ট হলেও আমার ও সব সহ্য হয়ে গেছে।
তবে কিন্তু কি?
নীলসাগর তলে গিয়ে আমি কি করবো?
তোমার যত প্রয়োজন তুমি গ্রহণ করবে, আর পথটাও চিনে রাখো। আমার অবর্তমানে তুমি প্রয়োজনমত এই পথ ব্যবহার করবে।
আপনি যা বলছেন তা কোনোদিন হবে না। আমি কোনোদিন এ পথে পা বাড়াবো না, কারণ আমার কোনো প্রয়োজন নেই।
একটু হাসির শব্দ শুনতে পেলো রীনা।
বনহুর হাসলো, হেসে বললো—মিস রীনা তুমি বৃদ্ধা নও। সবে তোমার জীবন শুরু, এক্ষুণি তুমি বলতে পারো না ধনসম্পদ তোমার প্রয়োজন হবে কিনা। পথ দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, যদি—...
না না আপনি চুপ করুন, নাহলে আমি আর এগুবো না, এই দাঁড়িয়ে রইলাম।
মিস রীনা তুমি এই মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়বে, তা হয় না তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এগিয়ে আসো।
রীনা না এগিয়ে পারলো না।
গভীর সাগর তলদেশ দিয়ে এই সুড়ঙ্গপথ এগিয়ে যাচ্ছে গোপন স্বর্ণগুহার দিকে। সম্পূর্ণ সোজাপথ নয় কখনও নেমে গেছে নিচে, কখনও বা উঠে এসেছে একটু উপরে। কিন্তু পথটা পরিষ্কার এতোটুকু বাধাবিঘ্ন নেই কোনো জায়গায়।
মাঝে মাঝে একটু সমতল জায়গা, সেখানে বসে তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারবে।
বনহুর গাড়ি থেকে নেমে আসার সময় একটা বড় থলি কাঁধে নিয়ে এসেছিলো। থলির মধ্যে কি আছে জানে না, রীনা, তবে সন্দেহ ও কিছু ছিলো না তার। কারণ হিরন্ময়ের মত নরপশু যে নয় ও ভদ্রলোক তাতে

কোনো ভুল বা সন্দেহ নেই। তবু একবার বললো রীনা—আপনার কাঁধে ঐ ঝোলাটার মধ্যে কি আছে?

বনহুর হেসে বললো—দেখতে পাবে এক সময়।

বনহুর আর রীনা এগুতে এগুতেই কথা হচ্ছিলো। তারা দ্রুত না চললেও বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলো! এক সময় বনহুর বললো—মিস রীনা, এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেওয়া হোক।

মিস রীনা বললো—আচ্ছা।

বনহুর বসে পড়লো, কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে রাখলো পাশে।

রীনা বললো—বড্ড পিপাসা লেগেছে।

অবশ্য রীনা এতটা পথ চলতে গিয়ে রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছিলো। পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিলো তার, কিন্তু বলেনি, বলে লাভ কি হবে এখানে তো পানি নেই তাই নীরব ছিলো রীনা এতক্ষণ। এবার গলাটা একেবারে শুকনো বোধ হওয়ায় বলেই বললো।

বনহুর ঝোলাটা খুলে রেখেছিলো, এবার সে ঝোলাটা কাছে টেনে নিলো।

রীনা তাকিয়েছিলো।

বনহুর ঝোলা থেকে বের করলো এক বোতল পানি আর কিছু বিস্কুট।

রীনার চোখ দুটো খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠলো।

বনহুর বিস্কুট আর পানির বোতল রীনার দিকে এগিয়ে দিলো—নাও।

রীনা বেশ পিপাসা বোধ করছিলো, তাই সে পানির বোতল এগিয়ে নিলো।

বনহুর বললো—এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো ঝোলায় কি ছিলো।

রীনা পানি পান করে বললো—আমি মনে করেছিলাম যাদুর সম্রাট বনহুরের অনুচর আপনি নিশ্চয়ই আপনার কাঁধে ওটা যাদুর ঝোলা। কথাটা শেষ করে হাসলো রীনা।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর বনহুর আর রীনা পুনরায় উঠে দাঁড়ালো। আবার চলতে শুরু করলো তারা।

বনহুরের হাতের টর্চের আলো তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

বনহুর আর রীনা যখন এগুচ্ছে তখন তারা শুনতে পাচ্ছে একটা গর্জনের মত আওয়াজ।

রীনা ভীত কণ্ঠে বললো—ও কিসের আওয়াজ?

বললো বনহুর—সমুদ্রের গর্জন মিস রীনা। তুমি হয়তো জানো না এখন আমরা কোথায়? গভীর সাগরের তল দিয়ে এখন আমরা হেঁটে চলেছি।

আর কতদূর হাঁটতে হবে?

পায়ে হেঁটে চললে অনেকদিন সময় লাগবে। আর কিছু গেলে আমরা লিফটের মত একটা জিনিস বা বাহন পাবো, সেই বাহনে চেপে আমরা অল্পসময়ে পৌঁছে যাবো সেই স্বর্ণগুহায়।

বললো মিস রীনা—এবার বুঝেছি আপনি সেদিন কিভাবে সেই গভীর সাগর তলে স্বর্ণগুহায় পৌঁছেছিলেন। আমি বিস্মিত হয়েছি, অনেক ভেবেছি এ নিয়ে।

বললো বনহুর—মনে করেছিলে আমি কোনো যাদুকর।

আপনি যখন দস্যু বনহুরের অনুচর তখন এটা সত্যিও হতে পারতো। যাক তবে আপনি এই সুড়ঙ্গ পথেই হঠাৎ সেই দন্ডে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন?

হাঁ, মিস রীনা।

ঐ মুহূর্তে যদি না পৌঁছতে পারতেন তাহলে হিরন্ময় আমাকে গলাটিপে হত্যা করতো। আমাকে সে স্বর্ণগুহার নীলকমল বা যক্ষী বানিয়ে রাখতো। ইস, কি ভয়ঙ্কর দিনটাই না সেদিন গেছে আমার।

আজও তো আমি তোমাকে হিরন্ময়ের মত নীলকমল বানিয়ে রাখতে পারি।

উহুঁ বিশ্বাস হয় না আপনি আমাকে......

মিস রীনা, অবিশ্বাসেও কিছু নেই। দস্যু বনহুরের অনুচর আমি বুঝতেই পারছো।

না না, আমি আপনাকে ভয় করি না।

যদি বলি তুমি যে পাপ করেছো তার শাস্তি ঐ নীলকমল হওয়া?

পাপ আমি যথেষ্ট করেছি কিন্তু সেজন্য আমি অনুতপ্ত ব্যথিত, কারণ ওসব আমার ইচ্ছাকৃত নয়!

তাইতো আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি মিস রীনা। নাহলে নারী বলেও তুমি আমার কাছে রেহাই পেতে না। যদি না তুমি নিজের পাপ কার্যের জন্য নিজে অনুতপ্ত হতে।

কথার ফাঁকে তারা এসে পড়ে একেবারে নীলসাগর তলে সুড়ঙ্গ পথে বাহনটার পাশে।

অদ্ভুত সে বাহন।

মিস রীনা প্রথমে চমকে উঠে, কারণ বাহনটাকে ঠিক একটা জন্তুর মত মনে হচ্ছিলো। একটা জীবন্ত জন্তুর মত উবু হয়ে পড়েছিলো বাহনটা।

বনহুর বাহনটার মাথার কাছে একটা সুইচে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বাহনটা মাথা চাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

রীনা ভীত হয়ে উঠেছিলো।

তখন মনে হচ্ছিলো জন্তুটার গলায় যেন একটা রশি বাঁধা রয়েছে। নিকষ কালো বাহনটা, সম্মুখে দুটি চোখের মত সার্চলাইট। বাহনটির মাথার সুইচে চাপ দিতেই বাহনটা যখন উঠে দাঁড়ালো চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো আর এক শক্তিশালী আলোকরশ্মি তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়লো সম্মুখে।

বনহুর বললো—রীনা তাড়াতাড়ি এই বাহনটির পিঠে উঠে পড়ো। বনহুর হাত বাড়ালো মিস রীনার দিকে।

রীনা বনহুরের হাতে হাত রাখলো।

বনহুর ওকে তুলে নিলো পাশে।

বনহুরের হাতের মুঠায় রীনার হাতখানা স্পর্শ হতেই রীনার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ অনুভব হলো। অনাবিল এক আনন্দ অনুভূতি, এ যেন এক সুধার পরশ। রীনা ওকে এমন নির্ভৃতে পেয়ে পরম নিশ্চিন্ত।

বনহুর বললো—বড্ড ভয় পেয়েছিলে মিস রীনা?

ভয়! হাঁ পেয়েছিলাম। অন্যমনস্ক মিস রীনা সজাগ হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো—বাহনটা ঠিক জন্তুর মত দেখতে কিনা, তাই প্রথমদিন আমিও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা, আপনি কি করে এমন দুর্গম পথের সন্ধান পেলেন বলুন না?

সে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

যদি বলতে দোষ না থাকে তাহলে বলুন না?

বনহুর বললো—স্বর্ণগুহায় পৌছে আপনাকে সব বলবো। বনহুর এবার বাহনটার কান ধরে টান দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহনটা সাঁ সাঁ করে চলতে থাকে, বিদ্যুৎগতিতে এগুচ্ছে বাহনটা।

রীনা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো। ওর ভয় হচ্ছে কখন সুড়ঙ্গের গায়ে টক্কার লেগে যাবে। বাহন থেকে মাত্র সামান্য ব্যবধান সুড়ঙ্গের দেয়ালের। শক্ত কঠিন দেয়ালে যদি কোনোক্রমে লেগে যায় তাহলে বাহনসহ দেহটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সেকি ভীষণ জোরে এগুচ্ছে বাহনটা।

মনে হচ্ছে মিনিটে পাঁচশত মাইল বেগে যাচ্ছে।

একটা শব্দ বের হচ্ছে না রীনার মুখ দিয়ে, নিঃশ্বাস ওর বন্ধ হয়ে আসছে যেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেলো।

হঠাৎ থেমে পড়লো বাহনটা।

বনহুর বলে উঠলো—বৈদ্যুতিক গোলযোগে বাহন আটকে গেছে।

রীনা অবাক কণ্ঠে বললো—বৈদ্যুতিক! এখানে বিদ্যুৎ আসবে কোথা থেকে।

সুচতুর হিরন্ময় কোনো এক দক্ষ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে এসে তাকে দিয়ে সাগরের জলস্রোত থেকে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ তৈরি করে নেয়, তারই দ্বারা চালিত হয় এই বাহন। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অবিরত পরিশ্রম করে সেই সুকৌশল ইঞ্জিনীয়ার এই বাহন তৈরি করে দেয়। যখন কাজ তার শেষ হলো তখন পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হলো মৃত্যু......

সত্যি!

হাঁ, একেবারে সত্যি।

কি শয়তান হিরন্ময়! দাঁত পিষে বললো মিস রীনা।

বনহুর বললো—নরপশু দক্ষ ইঞ্জিনীয়ারকে হত্যা করে ফেলে দিয়েছিলো সাগরের জলে।

আপনি এত জানলেন কি করে।

বলেছি তো পরে সব বলবো, এখন দেখি বাহনটা চালু করা যায় কিনা। না হলে বিপদ সুনিশ্চিত।

আমার কিন্তু বড় ভয় করছে।

মৃত্যু যখন একদিন হবেই তার জন্য ভয় পাবার কিছু নেই। বসো আমি দেখছি......বনহুর বাহন থেকে ঝুকে নেমে এলো নিচে, তবে একেবারে মাটিতে নয়। দড়ির মত শক্ত রড বেয়ে কিছুটা এগুলো, তারপর কি যেন করলো সে দাঁত দিয়ে, বাহনটা দুলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

বনহুর তাড়াতাড়ি রড বেয়ে বাহনে ফিরে এলো, বললো—ভাগ্যিস বাহনের সুইচ অফ্ করে দিয়েছিলাম, নইলে এই মুহূর্তে বাহনের আঘাতে আমার দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।

রীনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো।

বনহুর বললো—যখন বাহনটা বিকল হয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে আমি বাহনের সুইচ অফ্ করেছিলাম।

তাই রক্ষা পেলেন!

হাঁ, মিস রীনা।

বনহুর এবার বাহনের সুইচ অন্ করে দিলো।

অমনি বাহন তীরবেগে চলতে শুরু করলো।

❑

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পৌছে গেলো বনহুর আর মিস রীনা নীলসাগর তলে সেই স্বর্ণগুহায়।

বাহন আপনাআপনি থেমে পড়লো।

বনহুর নেমে দাঁড়িয়ে বললো—এসো।

রীনাও নেমে পড়লো নিচে।

স্বর্ণগুহায় পৌছবার পর সাগরের গর্জন আরও তীব্রভাবে শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি বুঝি সমস্ত ছাদখানা ভেংগে ধ্বসে পড়বে। চারপাশ থেকে গর্জনটা যেন গ্রাস করতে আসছে তাদের। মনে পড়ছে রীনার সেই দিনের কথা, যেদিন হিরন্ময় তাকে জলযানে করে এখানে নিয়ে এসেছিলো। একটা ভৌতিক আলোকরশ্মি তাকে অভিভূত করেছিলো। চারিদিকে ছড়ানো শুধু সোনা আর সোনা। সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলো রীনা এসব দেখে। বিস্ময়ভরা চোখে দেখছিলো সে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

পাশে পাশে চলছিলো হিরন্ময়।

রীনা তখনও বুঝতে পারেনি হিরন্ময় তাকে এখানে কেন এনেছে। রীনার মন আনন্দে ভরে উঠেছিলো। হিরন্ময় তাকে সব দেবে, এসব নাকি তার হবে। তাকে বানাবে হিরন্ময় নীলকমল......

কি ভাবছো রীনা?

বনহুরের কথায় চমকে উঠলো রীনা—এ্যাঁ!

কি ভাবছো?

ভাবছি সেদিনের কথা, কি ভয়ঙ্কর সেই দিনটা। আমি যমদূতকে সম্মুখে দেখেছিলাম, স্পর্শ করেছিলাম তার হাতের ছোঁয়া...না না, আমি আজ সেদিনের কথা ভাবতে চাই না। ভাবতে চাই না...আজ বড় সুন্দর লাগছে সবকিছু। আপনি যেই হননা কেন, আপনার সঙ্গ আমাকে অভিভূত করেছে।

মিস্ রীনা, তোমাকে এখানে কেনো এনেছি জানো?

জানতে আমি চাই না। শুধু আমি আর আপনি দু'জন এই নীলসাগর তলের মানুষ।

মিস রীনা, এখানে আমরা বেশিক্ষণ বিলম্ব করব না। তোমাকে এনেছি তোমার প্রয়োজনমত যা খুশি সোনাদানা অর্থ লও।

কি হবে সোনাদানা আর অর্থ দিয়ে?

একটা সংসার পাতবে।

সংসার!

হাঁ, সুখের নীড় যাকে বলে।

কিন্তু আপনি?

আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবো।

কোথায়? কোথায় চলে যাবেন আপনি?

হাসলো বনহুর—কেন আমার সর্দারের কাছে।

সর্দার! সেই দস্যু বনহুর আপনার সর্দার?

হাঁ।

আপনি এত মহৎপ্রাণ মানুষ হয়েও দস্যু সর্দারের এত ভক্ত?

নিমক যার খাই গুণগান তারই গাই। দস্যু হলেও সে তো মানুষ...

হিরন্ময়ও তো মানুষ কিন্তু শয়তানও তার কাছে হার মানে? আচ্ছা, আপনার সর্দার কি শয়তান না সাধু?

তা আমি জানি না, কারণ আমি তার নিমক খাই...

ও, আপনি তাহলে আপনার সর্দারকে মন্দলোক বলতে পারবেন না?

কেউ কোনোদিন তা পারে?

আচ্ছা আপনি বলেছিলেন হিরন্ময়ের ঐ সুড়ঙ্গ পথের ম্যাপ আপনি কিভাবে পেয়েছিলেন বলবেন?

হাঁ, বলতে চেয়েছি...

তবে বলুন?

সাগরতলে নির্জন গুপ্তগুহায় বসে আমরা নির্ভৃতে আলাপ করবো, তোমার কোনা অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধা হবে আমার—কি যে বলেন! আপনি আমার রক্ষক...

তাই এত সাহস?

হাঁ।

চলো আগে ঘুরেফিরে সবকিছু দেখে নিই?

বললো মিস রীনা—বেশ চলুন।

ছোটবড় কয়েকটা কক্ষ, ঠিক কক্ষ বলা যায় না কেমন যেন গুহার মত মনে হয়। প্রত্যেকটা গুহার ভেতরে দিয়ে লম্বালম্বি দরজা বা চলাচলের পথ। প্রত্যেকটা গুহার মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে সোনা আর সোনা। চোখ যেন ঝলসে যায়। বনহুর যখন টর্চের আলো ফেলছিলো তখন চকমক করছিলো সোনার অলঙ্কারগুলো।

বনহুর রীনাকে সব ঘুরেফিরে দেখালো।

রীনা বললো—কি সাংঘাতিক শয়তান ঐ হিরন্ময়। পৃথিবীর সব সোনা সে আত্নসাৎ করে এখানে এনে জড়ো করেছিলো!

কিন্তু নরপশু ভোগ করতে পারলো না।

হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

মিস রীনা, একথা ঠিক জানবে, অন্যায়ভাবে যে অর্থ বা ধনসম্পদ উপার্জিত হয় তা কোনোদিন তার ভোগে আসে না। তেমনি হিরন্ময় এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। চলো মিস রীনা, শেষ কক্ষটা দেখে আসি।

বনহুর আর রীনা শেষ কক্ষ বা শেষ গুহাটার দিকে অগ্রসর হলো।

এখনও সে কক্ষটা বন্ধ ছিলো।

বনহুর কক্ষের সম্মুখে এসে দরজা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো তারা, দেখতে পেলো শুধু টাকা আর টাকা—যেন টাকার স্তূপ!

রীনা বললো—এত টাকা!

হাঁ মিস রীনা, সব টাকা। না জানি কত দুঃস্থ মানুষের রক্তে সঞ্চিত এ অর্থ আজ সাগরতলে পচছে। মিস রীনা, তুমি ইচ্ছামত গ্রহণ করো।

না না, এ অর্থ নয়—এ অভিশাপ। আপনি আমাকে এ অভিশাপ গ্রহণ করতে বলবেন না।

মিস রীনা তুমি আজ অসহায়, হিরন্ময় তোমাকে পথে বসিয়েছে, এ অর্থ তোমার জন্য অভিশাপ নয়। তুমি নাও, যত তোমার খুশি নাও।

বনহুর নিজ হাতে টাকার ফাইলগুলো গুছিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো—চলো।

ফিরে এলো তারা পূর্বের সেই কক্ষে।

মিস রীনা বললো—বলুন না এবার আপনার সেই বিস্ময়কর গল্পটা? কিভাবে আপনি নরপশু হিরন্ময়ের সেই ম্যাপখানা পেয়েছিলেন?

তুমি দেখছি ভুলে যাওনি সে কথা। বেশ বসো, আমি বলছি। বনহুর নিজে বসে পড়লো একটু উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে।

মিস রীনাও বসলো তার পাশে।

বনহুর বললো—অনেক কথা বলতে হয় কিন্তু সবতো বলা এখন সম্ভব নয়, তবু বলছি। হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আমি আর্মকে ফলো করি, কারণ আর্ম হত্যা-রহস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলো।

হাঁ, আমিও জানতাম কিছু কিছু। তারপর?

বলছি...আমি প্রতি রাতে আর্মকে ফলো করে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতাম। আর্ম রাতের অন্ধকারে আত্নগোপন করে চলে আসতো সাগরতীরে। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করলাম। নির্জন সাগরতীরে একটা স্পীডবোট থাকতো, চালক বসে থাকতো তার উপর। আমি একদিন চালককে সরিয়ে ফেলে নিজে চালক সেজে বসলাম।

তারপর?

স্পীডবোট চালানো আমার কাছে সহজ, কারণ আমি পূর্ব হতেই এসব জানতাম। স্পীডবোট চালিয়ে চলেছি কিন্তু আমি তো আর্মের গন্তব্যস্থান চিনি না, তাই হলো মুস্কিল। হঠাৎ অসুস্থতার ভান করে স্পীডবোটের মধ্যে

শুয়ে পড়লাম। অগত্যা আর্ম স্পীডবোটখানা নিজেই চালিয়ে নিয়ে বললো। আর্মের গন্তব্যস্থান দেখতে এবং চিনতে আমার বেগ পেতে হলো না।

এবার বুঝেছি আপনি কেমন করে আংহাবারীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হাঁ, তারপর থেকে আমি স্পীডবোটের চালক হয়ে রোজই গিয়ে হাজির হতাম হিরন্ময়ের সেই জাহাজে, যেখানে চলতো তার সবরকম কুকর্ম।

ইস, আপনি তা'হলে সব দেখতেন?

হাঁ, তোমার কাজও আমি দেখেছি।

বিশ্বাস করুন, যা আমি করেছি সবই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমি তা লক্ষ্য করেছি আর লক্ষ্য করেছি বলেই তো তোমার মুক্তি দিয়েছি, দিয়েছি স্বাধীনতা। নাহলে তোমার স্থানও হতো সেই নরাধমদের পাশে। তোমার গলাতেও ঝুলতো বিশসের ওজনের লকেট।

উঃ !কি সাংঘাতিক মানুষ আপনি!

নারী বলেও তুমি রেহাই পেতে না আমার দেওয়া শাস্তি থেকে শোনো তারপর, তারপর আমি হিরন্ময়ের অনুচরের বেশে তার সব কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যাই এবং শুনতে থাকি তার আলাপ আলোচনা। এমনকি গভীর রাতে যখন হিরন্ময় তার গোপন ম্যাপখানা বের করে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতো তখন আমি আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতাম। ঐ ম্যাপখানা সে কাউকে কোনো সময় দেখাতো না এবং ঐ ম্যাপ সম্বন্ধে সে কাউকে বলতো না। সবার অলক্ষ্যে ম্যাপখানা সে দেখতো, আবার লুকিয়ে রাখতো ক্যাবিনের এক গোপন স্থানে। আমি সেই গোপন স্থান থেকে একদিন ম্যাপখানা সরিয়ে নিলাম। এবার বুঝতে পারছো কেমনভাবে ম্যাপখানা আমি পেয়েছি।

বুঝেছি, কি দুঃসাহসী আপনি! দস্যু বনহুরের অনুচর বলেই তো আপনি পেরেছেন এমন সাহসী কাজ করতে।

আর একটা কথা যা বলতে ভুলে গেছি। হিরন্ময় কিভাবে ঐ সুড়ঙ্গপথ অধিকার করে এবং সুকৌশলী ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা অদ্ভুত লিফট তৈরি করে নেয়, তার কাগজপত্রও ঐ সময় ম্যাপখানার সঙ্গে পেয়ে যাই।

তাইতো আপনার কাছে ঐ সুড়ঙ্গপথ এত সহজ! একটু থেমে বলে মিস রীনা—কতদিন হিরন্ময়ের সঙ্গে ছিলাম—কতদিন কত কাজে তাকে সাহায্য করেছি, মনের বিরুদ্ধে হলেও করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু ঐ শয়তান কোনোদিন আমাকে বিশ্বাস করেনি কিংবা কোনো কথা সে আমাকে বলেনি। এমনকি ম্যাপ দেখানো বা সুড়ঙ্গপথের সন্ধান জানানো দূরের কথা, নীলসাগর তলে তার স্বর্ণগুহায় কোনোদিন নিয়ে যায়নি। যদিও সে নিয়ে গেলো তা আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে......মিস রীনার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোঁটা অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আপনার সঙ্গে আমার ক'দিনেরই বা পরিচয় তাই আপনি আমাকে সব দেখালেন, এমনি সেই

গোপন সুড়ঙ্গপথে নিয়ে এলেন নীলসাগর তলে গুপ্তগুহায়। সত্যি আপনি কত মহৎপ্রাণ মানুষ......

বনহুর বললো—মিস রীনা, পথ তোমার চেনাজানা রইলো, তুমি প্রয়োজনমত অর্থ এখান থেকে গ্রহণ করবে। শুধু তোমার জন্য নয়, তোমার মত শত শত দুঃস্থ অসহায় মহিলার মঙ্গলের জন্য এবং দুঃস্থ জনগণের জন্য তুমি ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করবে।

মিস রীনার চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো, সে বললো—আমাকে যখন আপনার এত বিশ্বাস, তখন আপনি যা বলবেন তাই করবো।

আচ্ছা, এবার উঠা যাক! বললো বনহুর।

মিস রীনা অবাক চোখে তাকিয়ে বললো—আচ্ছা।

বনহুর আর মিস রীনা চেপে বসলো লিফটের বাহনে, লিফট চলতে শুরু করলো।

❑

বাড়িখানা মিস রীনার পছন্দ হয়েছে তো?

হাঁ সর্দার, বাড়িখানা তার খুব ভাল লেগেছে। খুব খুশি হয়েছে সে বাড়িখানা পেয়ে।

যাক, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। আপন মনে সিগারেট পান করে চললো সে।

রহমান দাঁড়িয়ে আছে পাশে, কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু চট করে বলার সাহস সে পাচ্ছে না। বার বার মাথা চুলকে নিজকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো।

রহমান বললো—সর্দার!

তুমি যাওনি রহমান?

না সর্দার।

কিছু বলবে?

সর্দার নীলসাগর তল থেকে ফিরে এসেই কান্দাই ফিরে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু......

বুঝেছি বাড়ি ফিরে যাবার জন্য মন খুব উতলা হয়ে উঠেছে, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে পুনরায় বলে বনহুর—আমারও কি কম, আমিও যে বড় উতলা হয়ে পড়েছি রহমান। মা, মনিরা তা ছাড়া জাভেদ হয়তো খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রহমান, জাভেদকে নিয়ে আমার বড় চিন্তা।

কেন সর্দার?

জাভেদ যত বড় হচ্ছে, বয়স যত বাড়ছে সে আরও বেশি চঞ্চল হচ্ছে। ওর স্বভাব যেন কেমন হচ্ছে—ঘোড়ায় চড়া, বস্ত্র চালনা, শিকার করা এসব যেন ওর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও পড়াশোনা মোটেই করতে চায় না।

সর্দার, জাভেদ যে আপনারই সন্তান।

তুমি বলতে চাও সে আমারই মত হোক?

না চাইলেও জাভেদ যে আপনারই গুণ পেয়েছে সর্দার, ওকে আপনি বাধা দেবেন না।

তুমি কি বলতে চাও সে.......

সর্দার, লেখাপড়া শিখে উচ্চশিক্ষিত হয়েও মানুষ অমানুষ হয়, আর কত মহৎ ব্যক্তি আছে যারা লেখাপড়া তেমন জানে না, তবু তারা দেশ, দশের ও জনগণের উপকার করে যায়। জাভেদ যদি লেখাপড়া না শিখেও আপনার মত মহৎপ্রাণ হয়......

না না, আমি চাই না রহমান, আমি চাই না সে আমার মত হোক। আমি তাকে হত্যা করবো রহমান, আমি তাকে হত্যা করবো।

সর্দার, এ আপনি কি বলছেন!

হাঁ, সত্যি কথা বলছি। বনহুর এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রাখলো তার আংগুলের সিগারেটটা, তারপর উঠে দাঁড়ালো। পায়চারী করতে লাগলো সে গভীর চিন্তান্বিতভাবে।

এমন সময় একজন লোক এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেলো রহমানের হাতে।

রহমান চিঠিখানা পড়ে নিয়ে বললো—সর্দার দেখুন!

কি?

চিঠি!

কার চিঠি?

মিস রীনা লিখেছে।

কি লিখেছে পড়ো, বনহুর দাঁড়িয়ে কান পাতলো চিঠিখানায় কি লিখা আছে শোনার জন্য।

রহমান পড়তে শুরু করলো—

> আমি বাড়িখানা পেয়ে খুব খুশি
> হয়েছিলাম, কিন্তু গভীর রাতে এ
> বাড়ির ছাদে এবং আশেপাশে
> একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়ায়।
> আমি এক মুহূর্ত এ বাড়িতে
> থাকতে পারছি না। আপনি চলে
> আসুন, আমাকে বাঁচান।
>
> —মিস রীনা

বনহুর বললো আশ্চর্য!

সর্দার, এ যেন এক অদ্ভুত কথা, বাড়ির ছাদে আশেপাশে একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়ায়। কোনো অশরীরী আত্মার আবির্ভাব হয় নাকি ও বাড়িতে?

কেমন করে বলবো বলো!

এক্ষুণি তাহলে যেতে হবে সর্দার।

বনহুর গম্ভীর মুখে বলবো—এ এক নতুন রহস্যজাল ছড়িয়ে পড়লো রহমান।

কি বলছেন সর্দার।

হাঁ, যাও গাড়িখানা নিয়ে এসো।

সর্দার, গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে।

চলো তাহলে।

বনহুর আর রহমান এসে গাড়িতে বসলো। অবশ্য রহমান বসলো ড্রাইভিং আসনে।

মিস রীনার নতুন বাড়িখানাতে পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। বনহুরের দ্রুতযান বলা যায় গাড়িখানাকে। এ গাড়িখানা বনহুর ফাংহায় এসে কিনেছে প্রচুর টাকা দিয়ে। অবশ্য বিনা কারণে সে কিনেনি বিশেষ প্রয়োজন বলেই বাধ্য হয়ে সে গাড়িখানা কিনেছে।

মিস রীনা ব্যস্তভাবে বেলকুনিতে পায়চারী করছিলো।

গাড়িখানা সে ছাদ থেকে দেখতে পেয়ে দ্রুত নেমে এলো নিচে।

বিরাট গাড়ি।

বাড়িটার পাশেই আর একটা বাড়ি আছে, বড় সুন্দর মনোরম সে বাড়িখানা।

বনহুর আর রহমান গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে চললো।

মিস রীনা বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো বনহুর আর রহমানকে।

বনহুর লক্ষ্য করলো মিস রীনার চোখের নিচে কালিমা পড়েছে, কেমন একটা উস্কখুস্ক ভাব তার চোখেমুখে বিরাজ করছে।

বনহুর আর রহমানকে দেখে বললো মিস রীনা—উঃ কি দুর্ভাবনায় না ছিলাম, এসেছেন সত্যি বাঁচলাম।

বনহুর বললো—কি এমন দুর্ভাবনা, যার জন্য আপনি এমন হয়ে পড়েছেন?

সব বলছি, আসুন আমার শোবার ঘরে।

তার আগে চলুন বাড়িটা একবার ঘুরেফিরে দেখে নেই। ভারী সুন্দর লাগছে বাড়িখানা আমার।

মিস রীনা মুখখানা ম্লান করে বললো—দু'দিন আগে আমারও খুব ভাল লেগেছিলো কিন্তু আজ......চলুন সব বলবো।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে এলো বনহুর, রহমান ও মিস রীনা!

এদিক ওদিক ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো তারা।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো পাশের বাড়িটার দিকে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো বনহুর, ভারী সুন্দর, বাড়িখানা দেখছি যেন বাংলাদেশের কোনো বাড়ির সঙ্গে তুলনা হয়।

রহমান বললো—হাঁ সর্দার, ঠিক বলেছেন।

রীনা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ঐ বাড়ি থেকে কাল রাতে দারোয়ান হারিয়ে গেছে! এর আগেও নাকি এমনি করে দারোয়ান হারিয়েছে। আরও নাকি ঘটনা ঐ বাড়িতে ঘটেছে......আপনি এসে ভালই করেছেন, আমার মোটেই ভাল লাগছে না এ বাড়িতে।

বনহুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো ঐ বাড়িখানা।

বেশ পুরোন বাড়ি, জায়গায় জায়গায় চুনবালি খসে পড়েছে। বাড়ির দক্ষিণে বিরাট একটা বাগান, তবে ফুলের বাগান নয়, ফলের বাগান। বাগানে নানারকম ফলগাছ আছে কতটা আমাদের দেশের আম-কাঠালের গাছের মত বড়সড়। বাড়ির উত্তরে একটা মস্তবড় পুকুর। পুকুরে শানবাঁধা সুন্দর ঘাট। পুকুরপাড়ে লম্বা লম্বা পাইনগাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত।

বনহুর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো পাশের বাড়িখানা। পিছনে দাঁড়িয়ে রহমান আর পাশে দাঁড়িয়ে মিস রীনা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নির্বাকভাবে ঐ বাড়িখানা লক্ষ্য করে বনহুর বললো—রহমান, চলো দেখি ঐ বাড়িখানার মালিকের সঙ্গে পরিচয় করে আসি।

মিস রীনা অভিমানভরা গলায় বললো—আপনাকে ডেকে আনলাম আমার বাড়ির কাহিনী শোনার জন্য, আপনি কিনা আমাকে একা রেখে চলে যাচ্ছেন পাশের বাড়ির মালিকের সঙ্গে আলাপ করতে।

বনহুর বললো—ফিরে এসে তোমার সব কথা শুনবো। এসো রহমান!

বনহুর আর রহমান সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

রীনা অভিমানে মুখ ভার করে করে দাঁড়িয়ে রইলো সিঁড়ির মুখে।

রহমান বললো—সর্দার, ও বাড়িতে যাচ্ছেন কেন?

পরে সব জানতে পারবে, এসো আমার সঙ্গে!

বনহুর আর রহমান এগিয়ে চললো বাড়িখানার দিকে। নিকটবর্তী হতেই নজরে পড়লো বাড়ির ফটকে লেখা আছে 'খোন্দকার বাড়ি' অবশ্য লেখাটা বাংলায় নয়, ইংরেজিতে।

বনহুর আর রহমান ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে, তখনই বাধা দিলো দু'জন লোক। লোক দু'টি দারোয়ান নয়, তবে সাধারণ মানুষ বলেও মনে হলো না। তাদের চালচলনে মনে হলো এরা গোয়েন্দা বিভাগের লোক হবে।

একজন জিজ্ঞাসা করলো—কাকে চাই?

বনহুর বললো—বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করবো।

অপরজন বললো—এখন দেখা হবে না।

বনহুর বললো—দেখা না করলেই নয়, এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমার গোপনে আলাপ আছে।

গোপনে আলাপ?

হাঁ।

আপনি কি তাহলে?

হাঁ, আমি ফাংহা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসছি।

আপনিও তাহলে দারোয়ানের নিরুদ্দেশ ব্যাপার নিয়েই......

হাঁ, পথ ছাড়ুন।

ওরা ফটক খুলে দিলো।

বনহুর আর রহমান ভিতরবাড়ির দিকে অগ্রসর হলো। বাড়ি খানা সেকেলে এবং কতটা বাংলাদেশের জমিদার বাড়ির মত দেখতে।

বিরাট ফটক পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমান বৈঠকখানার সম্মুখে।

ভিতরে বেশ কয়েকজন লোক ব্যস্তভাবে আলাপ-আলোচনা করছে বাইরে থেকে বোঝা গেলো।

বনহুর আর রহমান অপেক্ষা করতে লাগলো।

কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এলো কয়েকজন লোক। পুলিশের লোক এরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ দু'জনের দেহে পুলিশ ইন্সপেক্টারের ড্রেস রয়েছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার দু'জন ব্যস্তভাবে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ওদিকে থেমে থাকা গাড়ির দিকে চলে গেলেন। তাঁদের অনুসরণ করলো আরও দু'জন লোক। হয়তো বা তারাও পুলিশের লোক হবে।

আগন্তুকদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে বৈঠকখানার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক—বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, মাথার চুলে সবে পাক ধরেছে, চেহারাখানায় ফুটে রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ, গোঁফ জোড়া চমৎকার, চোখ দুটো ঘোলাটে না হলেও একটু লালচে।

বনহুর সালাম জানিয়ে সিঁড়ির ধাপে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান পিছনে।

তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন ভদ্রলোক—কাকে চান?

বনহুর বললো—খোন্দকার সাহেবকে।

ভ্রু কুচকে বললো ভদ্রলোক—খোন্দকার! কোন্ খোন্দকারকে চাই?

এবার বিপদে পড়লো বনহুর, কারণ সে কোনো খোন্দকারের নাম জানে না। একটু আমতা আমাত করে বললো সে—আমি সি, আই, ডি, অফিস থেকে এসেছি—নতুন কিনা, কারও নাম.......

জানেন না, এই তো?

হাঁ।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন তিনি সন্দেহের চোখে, তারপর বললেন—কিছুক্ষণ পূর্বে সি, আই, ডি, অফিস থেকে লোক এসেছিলেন, তাঁরা তো আপনাদের কথা কিছু জানাননি?

বনহুর বিব্রত হবার লোক নয়, সে বললো—আমি কোনো চাকরি করি না। সখ করে তাদের সাহায্য করি, তাই আপনাদের সংবাদটা জানতে পেরে......

এসেছেন, তাই না?

হাঁ।

আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমি সহজে আপনাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না।

আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আছে তবে দাঁড়িয়ে......

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চান?

অগত্যা তাই।

বেশ, তাহলে বলুন কি জানতে চান?

যদি কিছু না মনে করেন তবে প্রথমে আপনার নামটা জানতে চাই। অবশ্য দয়া করে যদি বলেন।

নাম জেনে কি উপকার করবেন বুঝতে পারছি না। তবে নাম বলতে আমার আপত্তি নেই। বিপদ যখন চলছে তখন নানাজনে নানা সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনারা যে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন বুঝতে পারছি না! শুনুন তবে আমার নাম খোন্দকার জামাল।

আপনি......

আমি বড়র ছোট মানে মেজো। এই তো সব জানা হয়ে গেলো, এবার যেতে পারেন—নামও শুনলেন, আমি কত নাম্বার তাও জানলেন......

আরও একটু জানার ইচ্ছা রাখি।

না, আর আমি কিছু জানাতে পারবো না।

দেখুন আমি এসেছিলাম আপনাদের বাড়ির দারোয়ান নাকি হারিয়ে গেছে এই সংবাদ শুনে।

ও আর নতুন কি হারিয়েছে, আরও হারাবে।

এ্যা, কি বললেন মিঃ খোন্দকার?

মিঃ নই, খোন্দকার জামাল বলবেন।

তাহলে আর কিছু জানতে পারবো না?

বেশি বিরক্ত করা আমার পছন্দ নয়।

তাহলে ফিরে যেতে হয়।

তাই যান।

দেখুন বড় আশা করে এসেছিলাম।

আমাদের বাড়ির গোপন রহস্য জানার জন্য, তাই না?

না না, আমি সবকিছু জানতে চাই না, তবে কয়েকটা কথা আমি জানার জন্য......

এসেছেন?

হাঁ।

তবে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করুন?

এবার বনহুর খুশি হলো, তাকালো সে একবার রহমানের দিকে।

রহমান মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ জামাল সাহেবের ব্যবহার তার কাছে মোটেই পছন্দজনক নয়।

বনহুর বললো—খোন্দকার জামাল, আপনাদের বাড়ির দারোয়ান কি আজ রাতেই নিখোঁজ হয়েছে?

আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন, বললাম তো সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করুন?

বনহুর হেসে বললো—আমি বরং কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই না, আপনিই বলুন যা ঘটেছে?

হাঁ, এইতো সুন্দর সংক্ষেপে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। খোন্দকার জামাল সাহেবের মুখখানা প্রসন্ন মনে হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন কিছু মনে মনে।

বনহুর আর রহমান পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় করলো।

রহমান তাকিয়ে দেখলো তার সর্দারের চোখেমুখে একটা দীপ্তভাব ফুটে উঠেছে।

খোন্দকার জামাল হঠাৎ বলে উঠলেন—আমি যদি সমস্ত ঘটনা বলি তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না, পা ব্যথা হয়ে যাবে, কাজেই বাধ্য হয়ে আপনাদের নিয়ে বসতে হয়।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়, চলুন ভিতরে চলুন।

একটু পূর্বে আপনি যে বললেন...

কখন কি বলি এসব মনে রাখলে চলে না, চলুন ভিতরে চলুন। খোন্দকারবাড়ি এসে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন তা হয় না। আসুন......

খোন্দকার জামাল পা বাড়ালেন বৈঠকখানার দিকে।

বনহুর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললো—এসো।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অবাক হলো বনহুর ও রহমান। ভিতরে এমনভাবে সাজানো যেন বনহুর বাংলাদেশের কোনো জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায় প্রবেশ করেছে তারা। দেয়ালে কয়েকখানা তৈলচিত্র পাশাপাশি টাঙ্গানো আছে।

বনহুর অবাক হয়ে দেখছে।

খোন্দকার জামাল অবাক হয়ে বলে উঠেন—কি দেখছেন, এরাই তো খোন্দকার বাড়ির ইতিহাস। এই যে পাশাপাশি পাঁচখানা তৈলচিত্র দেখছেন আমরা পাঁচভাই।

একটু থামলেন খোন্দকার জামাল।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—বসো।

রহমান বসলো।

জামাল এবং বনহুর ছবিগুলোর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, খোন্দকার জামাল বলে চললেন—এই ইনি হলেন আমার বড় ভাই খন্দকার খবির......নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো খোন্দকার জামালের।

বনহুর বললো—থাক, এসব ছবির পরিচয় নাইবা দিলেন।

খোন্দকার জামাল ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আপনিই সব ঘটনা জানতে চাচ্ছেন, আবার আপনিই বলছেন থাক......ব্যাপারখানা কি বলুনতো?

বনহুর বুঝতে পারলো তৈলচিত্রগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ বাড়ির ঘটনাগুলো, তাই সে হাতে হাত কচলে বললো—আচ্ছা বলুন আপনি।

আমার কথা শুনতে গেলে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। ধীরে ধীরে বলবো, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন।

আচ্ছা তাই বলুন?

বনহুর আগ্রহান্বিতভাবে দাঁড়ালো।

খোন্দকার জামাল বলতে শুরু করলেন—খোন্দকার খবির আমাদের সবার বড়, এ বাড়ির তিনিই মাথা ছিলেন......

তিনি কি এখন নেই?

বলেছিতো নতুন করে আর প্রশ্ন করবেন না। আপনি সংক্ষেপে প্রশ্ন করেছেন, আমিও সব কথা সংক্ষেপে বলে যাবো।

আচ্ছা ভুল হয়েছে, মাফ করে দিয়ে বলুন?

খোন্দকার খবির আজ নেই—মারা গেছেন না বেঁচে আছেন তাও জানি না। থামলেন খোন্দকার জামাল।

বনহুরের মনে একটা অধৈর্যভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো, দ্রুত শোনার জন্য সে অস্থির বোধ করছিলো। তবু সে নীরব রইলো, কারণ প্রশ্ন করে বসলে খোন্দকার জামাল যদি আর না বলেন। মনোভাব গোপন করে তাকিয়ে রইলো বনহুর জামাল সাহেবের মুখের দিকে।

জামাল সাহেব বলে চললেন—একদিন বড় ভাই খোন্দকার খবির সাহেব তাঁর শোবার ঘর থেকে নিখোঁজ হলেন।

নিখোঁজ হয়েছেন তিনি!

বললাম তো কথা বলবেন না, আমি যা বলছি নীরবে শুনে যান শুধু। আপনারা বুঝলেন না আমার বুকে কত জ্বালা, আমি জ্বলেপুড়ে মরলাম। শান্তি! শান্তি! একটু শান্তি চাই আমি......হাঁ, কি বলছিলাম, আমার বড়

ভাই খোন্দকার খবির নিখোঁজ হলেন তাঁর শোবার ঘর থেকে। সেদিন ছিলো অমাবস্যা রাত, গোটা পৃথিবীটা ছিলো অন্ধকার। সন্ধ্যা থেকে ঝুপঝাপ বৃষ্টি পড়ছিলো। পথঘাট ছিলো বড় নির্জন। আমরা সবাই শুয়ে পড়ি সন্ধ্যার পর পরই। আমাদের বাড়িতে সেদিন গন্ডগোলও হয়ে গিয়েছিলো। বড় ভাইয়ের সঙ্গে খোন্দকার কামালের—সে ছিলো চতুর্থ, ঐ যে তৈলচিত্রখানা তার। আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন খোন্দকার জামাল চার নম্বর ছবিটা।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো কেমন যেন একগুয়ে চেহারা, চুলগুলো বেশ বড়, চোখ দুটো মাতালের চোখের মত ঢুলু ঢুলু।

খোন্দকার জামাল বলে চলেছেন—বড় ভাইয়ের সঙ্গে গন্ডগোল করে বেরিয়ে গেছে কামাল সন্ধ্যার পূর্বে। সে রাতে আর ফিরে আসেনি, কারণ ভোরে দেখা গেলো তার ঘরের টেবিলে ভাত তেমনি সাজানো ছিলো। হাঁ, কি বলছিলাম, সেই রাতে যে খোন্দকার খবির নিখোঁজ হয়েছেন, তিনি আজও ফিরে আসেননি। তাঁর পিঠেই আমি, এ তো আমার ছবি। এ যে পাশে ওটা আমার ছোট, ওর নাম খোন্দকার আবদুল্লাহ, বড় সরল সোজা মানুষ, বড় একটা কারও সঙ্গে কথা বলে না, আপনমনে যা খুশি তাই সে করে। খায় দায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ায়, কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না—ছোটবেলা থেকেই ওর স্বভাব নিরিবিলি থাকা।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো খোন্দকার আবদুল্লাহর তৈলচিত্রখানা। ভাবগম্ভীর শান্ত-চেহারা, চোখ দুটো তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হচ্ছে। গোফ আছে খোন্দকার জামালের মত একজোড়া।

খোন্দকার জামাল বলে যাচ্ছেন—ওর কথাতো বললাম ও আমাদের চার নম্বর বড়—খামখেয়ালী আর একগুয়ে। তবে বড় ভাইয়ের নিরুদ্দেশের সংবাদে শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। যেদিন ওর সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছিলো সেইদিন নিখোঁজ হয়েছে বলে কামালের এত ব্যথা। কামাল এখন পাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে খোন্দকার জামাল সাহেবের বুক চিরে। এবার তিনি সর্বশেষে ছবিটা দেখিয়ে বলেন—ওটা সর্বকনিষ্ঠ খোন্দকার নেহালের ছবি। পাঁচ ভাই আমরা, বিরাট জমিদারী—অনেক অর্থ, অনেক বিষয় আসয় কিন্তু শান্তি নেই, আমাদের বাড়িতে কোনো শান্তি নেই। আসুন আমার সঙ্গে, দেখাচ্ছি আরও একটা জিনিস, আসুন......

দোতলার বেলকুনিতে এসে দাঁড়ালো খোন্দকার জামাল, আংগুল দিয়ে দক্ষিণের বাগানবাড়িটা দেখিয়ে বললেন—জানেন ঐ যে বাগানটা দেখছেন ওটা বড় ভুতুড়ে বাগান। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে এ বাগানের মধ্যে দেখা যায় একটা ভয়াল আলোকরশ্মি। কেমন যেন নীলাভ আলো। এ আলো দেখলে গা শিউরে উঠে। কেমন নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায় আলোটা বাগানের মধ্যে......

বনহুর বিস্ময় নিয়ে শুনে যাচ্ছে খোন্দকার জামালের কথাগুলো। যদিও তার মনে নানা প্রশ্ন জাগছে তবু সে নীরবে শুনছিলো, কথা বললে তিনি যদি

আর না বলেন। যা তিনি বলে যাচ্ছেন তাই বনহুরের জানার পক্ষে যথেষ্ট। এবার ফিরে তাকালেন বাড়ির উত্তরে পুকুরটার দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—ঐ যে পুকুর দেখছেন, এটা বড় অপেয়া পুকুর। ঐ পুকুরের পানিতে মাঝে মাঝে ভীষণ তর্জন-গর্জন শোনা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় পুকুরের পানি যেন তোলপাড় করছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে পুকুরের নিকষ কালো পানির দিকে।

এমন সময় কেউ যেন তাঁর কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

খোন্দকার জামাল বললেন—আমার ছোট ভাই খোন্দকার আব্দুল্লাহ।

বনহুর ফিরে তাকাতেই খোন্দকার আব্দুল্লাহ তার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।

খোন্দকার জামালের মুখে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠেছে। বলেন তিনি—একে তুমি চিনবেনা আব্দুল্লাহ ভদ্রলোক এসেছেন আমাদের বাড়ির গোপন সন্ধান জানতে।

ভাবগম্ভীর আব্দুল্লাহ বললেন—তা দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে চলুন?

খোন্দকার জামাল বললেন—তুমি ভিতরে যাও। এখনও খোন্দকার বাড়ি সম্বন্ধে সব কথা ওকে বলা হয়নি......

খোন্দকার আব্দুল্লাহ চলে যান।

বলতে শুরু করেন খোন্দকার জামাল সাহেব—শুধু কি তাই, প্রায়ই গেটে দারোয়ান হারিয়ে যাচ্ছে। ক'মাস আগে হারিয়েছে রহিম দারোয়ান, তার আগে হারিয়েছে কালু দারোয়ান, আজ রাতে হারিয়েছে দীনু দারোয়ান।

বললো বনহুর—বলেন কি! এ বাড়িটা তাহলে তো সাংঘাতিক?

শুধু সাংঘাতিক নয়, ভয়ঙ্করপুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় রাতেই বাড়ির আশেপাশে এখানে সেখানে দেখা যায় একটা অদ্ভুত ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ছায়ামূর্তি।

হাঁ।

বনহুর ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে মিস রীনার চিঠিখানা। বাড়ির ছাদে এবং আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় একটা ছায়ামূর্তি। মিস রীনা ভীত আতঙ্কিতভাবে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো.....

কি ভাবছেন? ভাবছেন এমন কথা তো কোনোদিন শোনেননি। সত্যি তাই, এ বাড়িতে কোনোদিন ভূতের উপদ্রব ছিলো না। আমরা কত শান্তিতেই না এ বাড়িতে কাল কাটিয়েছি! কিন্তু এখন এ বাড়ি হয়েছে এক অভিশপ্ত পুরী। কথাগুলো বলে থামলেন খোন্দকার জামাল।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলো তাঁর কথাগুলো। সব যেন বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তবে কি খোন্দকার বাড়ির ছোঁয়া লেগেছে মিস রীনার বাড়িখানাতে?

সেদিন আর বেশি বিলম্ব করা উচিত মনে করলো না বনহুর সেখানে, কারণ মিস রীনা প্রতীক্ষা করছে তাদের পথ চেয়ে।

বনহুর আর রহমান খোন্দকার বাড়ি থেকে ফিরে এলো মিস রীনার কাছে।

ওরা ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলো মিস রীনা—কি দেখলেন ও বাড়িতে?

বনহুরকে মিথ্যা বলতে হলো, সে বললো—কিছু না।

শুনলাম ও বাড়ির দারোয়ান নাকি আজ রাতে উধাও হয়েছে?

হাঁ।

সত্যি?

মনে হয় সত্যি।

আমার কিন্তু এ বাড়িতে কেমন ভয় ভয় লাগছে। আপনাকে আজ রাতে যেতে দেবো না কিন্তু।

বনহুর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি আজ থেকে যেও, মিস রীনা যখন বলছে।

রহমান বললো—আচ্ছা।

মিস রীনা বেশি খুশি হলেও চুপ থাকতে বাধ্য হলো।

বনহুর বললো—আমার জরুরি একটা কাজ আছে, তাই আমাকে যেতে হচ্ছে মিস রীনা। আবার কাল আসবো।

বনহুর বিদায় গ্রহণ করলো।

❒

গভীর রাত।

সমস্ত পৃথিবী নীরব নিঝুম। নিকষ অন্ধকারে গোটা শহর আচ্ছন্ন।

দ্বাদশীর চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ।

মিস রীনা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে বেলকুনির দিকে। কাল ঐ বেলকুনিতে সে ছায়ামূর্তি দেখেছিলো একটা। আজ গাটা তার ছম ছম করছে, যদি আজও সেই ছায়ামূর্তি দেখা যায়।

পাশের কক্ষে বসে আছে রহমান।

রহমানের হাতে গুলীভরা পিস্তল, সেও প্রতীক্ষা করছে যদি কোনো ছায়ামূর্তি নজরে পড়ে তাহলে সে গুলী করবে।

রাত বাড়ছে।

না, আজ কোনো ছায়ামূর্তি দেখা গেলো না। মিস রীনা নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বন্ধ করলো।
অমনি একটা শব্দ হলো আশেপাশে কোথাও যেন।
মিস রীনা চমকে উঠলো।
সজাগ হয়ে উঠে বসলো সে বিছানায়, তাড়াতাড়ি বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো। ওদিকের জানালার পাশ থেকে দ্রুত সরে গেলো কে যেন। রীনা বলে উঠলো—কে? কে ওখানে?
কোনো সাড়াশব্দ নেই!
মিস রীনা দৌড়ে গেলো জানালার ধারে কিন্তু আর কাউকে দেখা গেলো না। পিছন ফিরতেই দেখলো রীনা তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রহমান। তার হাতে উদ্যত রিভলভার।
মিস রীনার ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দুবিন্দু ঘাম। দু'চোখে তার ভয়াতুর ভাব।
রহমান বললো—মিস রীনা, আমিও দেখেছি একটা ছায়ামূর্তি আপনার কক্ষের জানালার পাশ থেকে সরে গেলো। আমি আমার কক্ষ থেকেই লক্ষ্য রেখেছিলাম, কিন্তু পারলাম না, গুলী ছুড়বো কিনা ভাবছি অমনি ছায়ামূর্তিটা যেন হাওয়ায় উবে গেলো।
বললো রীনা—মিঃ রহমান, কি করবো? আমি যে ঐ ছায়ামূর্তিটাকে সহ্য করতে পারছি না! রীনা কথাগুলো বলতে বলতে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো।
রহমান বললো—ভয় কি মিস রীনা, আমি তো পাশের কক্ষেই আছি। তাছাড়া ছায়ামূর্তি আপনার কোনো ক্ষতিসাধন করবে বলে মনে হয় না!
কিন্তু আমি যে তাকে দেখে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমার কি মনে হয় জানেন? সব হিরন্ময়ের চক্রান্ত। আমাকে এ বাড়িতে সে থাকতে দেবে না, তাই কোনো লোককে আমার পিছু লেলিয়ে দিয়েছে।
না না, ও আপনার ভুল। হিরন্ময় আজ মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনছে।
কিন্তু আমার যেন মনে হয়......
বলুন মিস রীনা?
তার কোনো সহকারী আছে যে আমাকে এভাবে ভয় দেখাচ্ছে। সুযোগ খুঁজছে সে আমাকে হত্যা করে বসবে।
আপনি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমান, আমি আপনার কক্ষের পাশেই থাকবো।
রহমান কথাটা বলে বেরিয়ে যায়।
মিস রীনা দু'চোখে ভয় নিয়ে বসে থাকে বিছানায়।
এক সময় রাত ভোর হয়ে আসে।
ঘুমিয়ে পড়ে মিস রীনা।
এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠে। রহমান তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যায়। দেখতে পায় গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে খোন্দকার জামাল।

খোন্দকার জামাল রহমানকে দেখেই বলে উঠলেন—যিনি কাল আমার ওখানে গিয়েছিলেন তিনি কোথায়। তাঁকে আমার প্রয়োজন।

রহমান বললো—তিনি নেই, বলুন আমি যদি কোনো উপকার করতে পারি।

না, আমি সবাইকে বিশ্বাস করতে পারি না। অত্যন্ত গোপন কথা......খোন্দকার জামাল বেরিয়ে গেলেন।

রহমান তাকিয়ে রইলো।

বৃদ্ধ জামাল সাহেব সোজা চলে গেলেন খোন্দকার বাড়ির দিকে।

রহমান ভাবলো, আশ্চর্য এই বৃদ্ধ, আশ্চর্য তাঁর চালচলন। তবে রহমান প্রথন দিনই লক্ষ্য করেছে, লোকটার মাথায় কিছু গোলযোগ আছে।

রহমান ভিতরবাড়ির দিকে পা বাড়াতেই একটা লোক ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালো, লোকটা বৃদ্ধ কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ তার চেহারা, বললো সে—সাহেব, বড় অসহায় আমি, যদি দয়া করে একটা চাকরি দিতেন!

রহমান অবাক হলো, লোকটা কোনো কথা না বলে সোজা চাকরি চেয়ে বসলো। কে এই লোক, তবে কি কোনো দুষ্ট ব্যক্তি! এগিয়ে গেলো রহমান, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো—চাকরি হবে না, চলে যাও।

এমন সময় মিস রীনা এসে দাঁড়ালো সেখানে। রহমানকে লক্ষ্য করে বললো ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন। জানেন তো আমার লোকের প্রয়োজন। এত বড় বাড়িখানায় নাকি একটা চাকর-বাকর পাইনি এখনও, তাছাড়া একজন দারোয়ান দরকার।

কিন্তু একেবারে নতুন লোক রাখা ঠিক হবে কি?

নতুন ছাড়া পুরোন লোক কোথায় পাবেন বলুন? একে আমার বিশ্বাস হচ্ছে, কারণ ছেলে—ছোকরা নয়, বেশি বয়সী।

লোকটা মিস রীনাকে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলো। আরও আশ্বস্ত হলো তার কথা শুনে। দু'চোখে অসহায় চাহনি, মুখে একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, চুলগুলো তেলবিহীন চেহারাখানা, মজবুত বলিষ্ঠ।

বললো রীনা—এমনি একটা লোকেই দরকার বুঝলেন মিঃ রহমান? কমবয়সী লোকগুলোকে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না।

হেসে বললো রহমান—হিরন্ময় তো কমবয়সী ছিলো না, তবু তো সে......

ঐ একটা লোক যে বয়সী ব্যক্তি হয়েও নরশয়তান ছিলো।

রহমান বললো—আপনি যা মনে করেন তাই করুন, তবে হঠাৎ এভাবে কোনো লোককে না রাখাই ভাল।

আপনি বুঝবেন না এত বড় বাড়িখানাতে আমি একা কিভাবে যে থাকি! লোক কত খুঁজছি পাচ্ছি না। মিস রীনা নিজ হাতে গেট খুলে দিয়ে বললো—ভিতরে এসো।

লোকটা ভিতরে এলো।
রীনা বললো—তুমি কি কি কাজ করতে পারো?
সব পারি রান্নাবান্না ছাড়া।
বেশ, আমি রান্নাবান্নার জন্য আলাদা লোক রাখবো, তুমি শুধু পাহারাদারের কাজ করবে।
আচ্ছা, তাই করবো।
রহমান কিছুটা অবাক হলো মিস রীনার আচরণে। কারণ চেনাজানা নয় একটা পথের লোককে এভাবে বাড়িতে জায়গা দেওয়া মোটেই সমীচীন হলো না।
জায়গা তো দিলো মিস রীনা ওকে।
কিন্তু একটু পরেই সে উধাও।
রীনা তো বেকুফ বনে গেলো, সে ছুটে এলো রহমানের পাশে, বললো—আপনার কথা না শুনে আমি ভুল করেছি। পালিয়েছে লোকটা।
বলেন কি!
হাঁ, সত্যি।
এমন সময় লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো সেখানে।
মিস রীনা ওকে দেখেতো অবাক, বলে উঠলো—কোথায় গিয়েছিলে তুমি?
আমার পুঁটলিটা ফেলে এসেছিলাম।
কোথায় ফেলে রেখে এসেছিলে? তুমিতো বললে তোমার কোনো বাড়িঘর নেই।
না, আমার কোনো বাড়িঘর নেই। একটা গাছের নিচে রাতে ঘুমিয়েছিলাম কিনা, ভুল করে পুঁটলিটা সেখানে ছেড়ে এসেছিলাম।
ওতে কি আছে তোমার? বললো মিস রীনা।
ও বললো—আমার সব সম্পত্তি এর মধ্যে আছে।
হাসলো রীনা, তোমার সব সম্পত্তি ওর মধ্যে আছে, তাই না?
হাঁ, মা-জী।
রহমান বললো—একবার ওর সব পরীক্ষা করে দেখা দরকার মিস রীনা।
না না, ওর ঐ পুঁটলিতে কি এমন থাকতে পারে যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তুমি যাও ঐ যে ওপাশে ঘর আছে ওটাতে তুমি থাকবে। আর শোন, তোমার নামটা কিন্তু এখনও শোনা হয়নি। কি নাম তোমার?
আমার নাম?
হাঁ, বলো?
কোনটা বলবো, যেটা বাবা রেখেছিলো, না মা রেখেছিলো?
দুটোই বলো যেটা পছন্দ হয় সেই নাম আমি ব্যবহার করবো।

বললো সে—বাবা রেখেছিলো ভুলু, বড্ড খোলা কিনা তাই। আর মা রেখেছিলো পেটু, বড় বেশি খাই কিনা......

যাও তোমাকে ভুলু বলেই ডাকবো, পেটু বড় সুবিধার নাম নয়। মিঃ রহমান, আপনি কি বলেন?

রহমানের ওকে মোটেই ভাল লাগছিলো না। কথাবার্তা চালচলন সব যেন কেমন সন্দেহজনক। তবু বললো সে—ভুলুই ভাল।

ভুলু পুঁটলিখানা বগলে চেপে চলে গেলো যেদিকে মিস রীনা তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলো।

রহমান প্রতীক্ষা করছে তার সর্দার এলে ভুলুকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করবে সে। মিস রীনার মুখের উপর কোনো কথা তো সে বলতে পারে না!

কিন্তু পুরো দু'দিন এলো না বনহুর।

রহমান রীনাকে ছেড়ে যেতেও পারে না, কারণ বনহুর বলে গেছে যেন কোনো সময় রীনাকে একা ছেড়ে চলে না যায়। তাই রহমান এ বাড়ি ছেড়ে এক পা নড়তে পারছে না।

ভুলু কিন্তু মিস রীনা আর রহমানকে দু'দিনেই মুগ্ধ করে ফেলেছে। কথা সে কম বলে, কারও সামনে সে বেশি আসে না। তবে কাজের বেলায় সে পাকা, সমস্ত রাত সে বাড়ির চারপাশে সজাগভাবে পাহারা দেয়।

মিস রীনা আর রহমানকে জেগে জেগে আর কাটাতে হয় না।

দু'দিন হলো ছায়ামূর্তিও উধাও হয়েছে, একটাবারও সে আসেনি।

ভুলু বলেছে, রাতে আমি পাহারা দেবো কিন্তু দিনের বেলা আমাকে ঘুমোতে দিতে হবে। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে!

মিস রীনা তো খুব খুশি, সে বলেছে দিনের জন্য আমার অন্য লোক থাকবে, রাতে পাহারা দিবে তুমি। কেউ তোমাকে দিনের বেলা বিরক্ত করবে না।

রহমানও মিস রীনার কথায় যোগ দিয়েছিলো, কারণ ভুলু যা বলেছে মন্দ বলেনি।

তাই ভুলু রাতে জেগে জেগে পাহারা দিতো আর দিনে সে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতো।

দু'দিন পর এলো বনহুর।

এসে সে রীনার মুখে শুনলো ভুলুর সব কথা। লোকটা একটু খেয়ালী তা ছাড়া খুব ভাল।

রহমানও সায় দিলো তার কথায়।

মিস রীনা বললো—প্রথমে মিঃ রহমান ভুলুকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলো কিন্তু এখন তার আচরণে সেও মুগ্ধ। এ বাড়িতে আসার পর থেকে একটা রাত আমি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোতে পারিনি, আর এ দুটো রাত কত আরামে ঘুমিয়েছি।

রহমান বললো—হাঁ, সত্যি কথা, এ দু'দিন ছায়ামূর্তি বা কিছু নজরে পড়েনি। ভুলু বড় ভাল লোক, সমস্ত রাত সে ঘুমায় না।

বেশ, তোমাদের যদি ওকে এত পছন্দ তাহলে থাক। তবে আমি একবার তাকে দেখতে চাই, বললো বনহুর।

রহমান বললো—হাঁ, আপনি তাকে দেখুন সত্যি সে ভাল লোক কিনা?

মিস রীনা বলে উঠলো—মিঃ রহমান, এখনও তার প্রতি আপনার সন্দেহের ছোঁয়াচ? দেখুন মিঃ আলম আমি বলছি সে ভাল লোক। রাতে জেগে থাকে, দিনে সে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমায়। তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

বললো বনহুর—বেশ, আমি তাকে দেখতেও চাই না। তবে খেয়াল রাখবেন অত্যন্ত বিশ্বাস ভাল নয়।

বনহুরের ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সে তাকালো রহমানের মুখের দিকে।

রহমান বললো—ভুলুকে আমিও প্রথম অবিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু তাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছি সে একজন আপনভোলা লোক।

তাই যেন হয়। বনহুর একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো।

ঐ মুহূর্তে তার দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকের জানালায়, একটা ছায়ামূর্তি যেন এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো জানালাটার আড়ালে, বনহুর চাইতেই ছায়ামূর্তিটা সরে গেলো দ্রুতগতিতে।